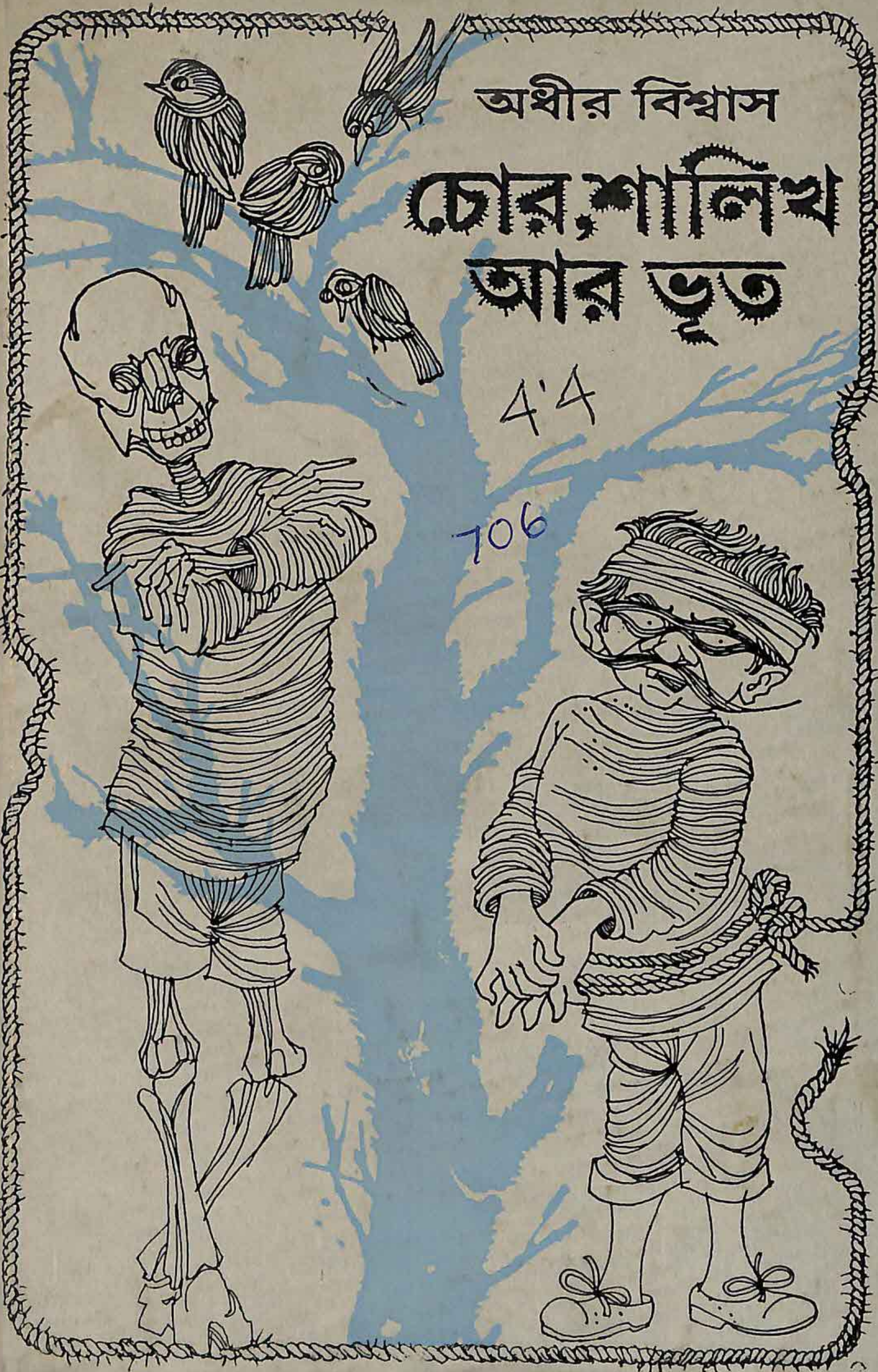
অধীর বিশ্বাস

চোর, শালিখ আর ভূত



চোর, শালিখ আর ভূত

অধীর বিশ্বাস

গীতাঞ্জলি প্রকাশনী
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কোলকাতা □ ৭৩

CHOR, SHALICKH ĀAR BHUT

(Short Stories for Children)

by

ADHIR BISWAS

প্রকাশক
শুভাশীষ বল

প্রথম-গীতাঞ্জলি সংস্করণ
বইমেলা, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায়

দাম—আট টাকা

মুদ্রক
শ্রীকালীচরণ দাস
মহাকালী প্রেস
১৯/ই গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মা-বাবার
পুণ্য স্মৃতিতে

এই লেখকের আরো কিছু বই

পরের মানুষ

রুপোর বিছে

সূচি



ধুনচি ধরিয়ে সন্ন্যাসীরা দৌড় দিয়েছে। 'শিব শিব মহাদেব—দেব।' মূল সন্ন্যাসী একদম সামনে। মাথায় পাটবান। অন্যদের হাতে বেতের ছড়া, তার চটাস চটাস শব্দের পিছনে ঢাকীঅলা।

রাত এখন কত, তা ঠিক বলা যাবে না। যেদিকে তাকানো যাক না কেন, শুধু অন্ধকার। অন্ধকার আর অন্ধকার। তবে রাত যে খুব একটা হয়নি তার কারণ ঝিনেদা-মাগুরা রাস্তা দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়। অর্থাৎ বাস-লরি এখনও চলছে।

চারদিক বিদমান জঙ্গল। একদিকে দত্তদের আমবাগান, মতি মৌলানার বাঁশবন। শনের ভুঁই আর পান বরোজের পাশ দিয়ে রতনদের পুরানো বাগিচের কালা-আমতলার পাশেই সেই হাজরাতলা।—এখানেই সন্ন্যাসীদের আজ হাজরাবাটা, মহাভোগ। ওদিকেই যাচ্ছে ওঁরা।

হাজরাতলার কোল ঘেঁষে ঝুলির বাগান। সেইখানে লোকে দিনের বেলায় যেতে ভয় পায়। একেবারে যে কেউ যায় না, তা নয়। তবে যারা যায় বুকের পাটা আছে বলতে হবে। ওর তলায় রাশি-রাশি আম পড়ে থাকলেও কেউ সহসা ছোঁয় না নাকি।

বহুকাল আগে সকালবেলা এক রাখাল ছেলে গরু চরাতে চরাতে দিব্যি শিস দিতে দিতে এগোচ্ছিল। হঠাৎ দেখে সামনেই মূর্তিমান এক বউ। সে কি দৌড়! আর চিৎকার—ভূত ভূত। সঙ্গে যেসব গরুবাছুর ছিল তারাও শেষমেষে ছুট দিয়েছিল। সেই থেকে

বাগানটা হয়ে গেল অপবিত্র। তাইজন্য জমিদারবাবু দূরের এক অচেনা লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিলে কী হবে! যে ভয়ের কথা চালু হয়ে গেল তা কি আর সহসা কারও মন থেকে মুছে যায়?

লোকে মাঠে কাজ করতে গেলে যদি দেখে ঝুলির বাগান ওই সামনে, অমনি কাজটাজ তাড়াতাড়ি সেরে বুঝি পালাতে পারলে বাঁচে।

কারও মুখে কথা নেই। লক্ষ্য এক। একেবারে আসল আস্তানায় গিয়ে কাজ হবে। বেনিয়ম হলে রক্ষে থাকবে না। চেলাচামুণ্ডা সব ওৎ পেতে আছে। এ এলাকা তাদের। ছোট ছোট বাচ্চা ভূত নাকি পাহারা দিয়ে বেড়ায়। এরাই হচ্ছে আলেভুলো। সামনে পড়লে ভুলিয়েভালিয়ে জমির আলে পুঁতে রেখে গিয়ে হেড ভূতের কাছে খবর দেয়। বড় ভূত ওদের পিঠ চাপড়ে বলে—সাঁবাশ!

ওই যে! ভালো করে চোখ দিলে বোঝা যাবে কেমন ধরনের একটা আলো চক্কর খাচ্ছে বাগানের চারদিক। কিন্তু বুকের পাটায় জোর থাকলে কিসের ভয়? —শিব শিব মহাদেব—দেব।

চৈত্র মাস—গাজন-মাস! এই সময় সন্ন্যাসীরা রাস্তায় রাস্তায়। 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে।' কেউ কেউ শিব-দুর্গা বাচ্চা ছেলেদের সাজিয়ে ভিক্ষে করে। খালি গা। খালি পা। গেরুয়া কাপড়ের ওপর নতুন গামছা পেঁচানো। গলায় উত্তরীয়। হাতে মালসা বা ধামা।

নির্জন জঙ্গলে, লোকচক্ষুর আড়ালে সন্ন্যাসীরা ঢুকে গেছে। দিনমানে গোবরজল ছিটিয়ে পরিষ্কার করে গেছে নিতাই ও রামা।

সঁড়াগাছকে মালা আর শিঙা দিয়ে সাজিয়ে গেছে। সামনে টকটকে সিঁদুরের ত্রিশূল পোঁতা।

ওই পাটবান মাথায় ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু হল। যেন তাণ্ডব নৃত্য। কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। কোনও দিকে খেয়াল নেই। জিতেন তার মধ্যে নাচ থামিয়ে ভোগ সাজিয়ে দেয়। এই ভোগ খেতে 'তেনারা' আসবেন। হয়তো সবাই 'প্রেজেণ্ট স্যার'। ভূতদের তো দেখা যায় না। আর যে দেখে ফেলে সেও নাকি মরে গিয়ে ভূত হয়ে যায়।

বাজাতে বাজাতে ঢাকীঅলার চুল ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। সব ঘোর উন্মাদ। এই গভীর রাত্রে সারা বনে এখন ঢাকের বাজনা— ঝাউর গিজির গিজঘিনিতা। ঘিনিতা…।

হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা ষাঁড় শনের ভুঁইতে ঢুকে গেল। দেখল সবাই স্পষ্ট। ঝুপঝুপ শব্দে আমের গুটি ছিটকে পড়ল। টের পেল সবাই। কিন্তু না। এসব ছলনা। এদিকে মন দিলে চলবে না। --ঢাকী ভায়া ঢাক বাজাও, মাথা নাড়ো ঘন।

ঢাকে নতুন করে বোল ওঠে—ড্যাড্ডানাটাং ড্যাডাং। আবার নাচ। নিচে পাটবন। শুধু কয়েকটা সলতে জ্বলছে। নাচতে নাচতে বেঁহুশ হয়ে পড়ল বুঝি। ভর হয়েছে। অন্যায় হলে এক্ষুনি জানা যাবে। নিতাইয়ের মুখ দিয়ে গ্যাঁজা বেরোচ্ছে। ধীরে ধীরে নাচটাচ থেমে গেল। 'ব্যোম শঙ্কর' বলে সবাই জোড়াসন হয়ে বসে পড়ল।

সঁড়াগাছ বেয়ে অন্যসব গাছের শিকড় নেমেছে। কলার পাতায় ভোগ সাজানো। সাতজনের সাত মালসা। এমন সময় গড় হয়ে প্রণাম দেবে। এখন চোখ খুলতে নেই। উহু…একদম নয়।

'কী হবে দেখলে ?' রামা দলের গাট্টাগোট্টা। ওর আবার জেদ বেশি। মনে মনে ভাবে দেখাই যাক না!

বাবার নাম করে সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম দেবে, তার আগেই মাথা তুলে ফেলল। 'ওরে বাপরে…' —ওই যে একবার চেঁচিয়ে উঠে ধপাস করে পড়ল আর ওঠাউঠি নেই। এমনভাবে অনেকক্ষণ ছিল নাকি।

সেদিনের ঘটনা জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে নাক কান মলে দিব্যি খায়। বলে, ওকথা বলো না আর। ঘাট হয়েছে। তবে কথায় কথায় বলেও ফেলে তার কথাগুলো। বলে আর নমস্কার করে। 'আর না। ওরেব্বাপ! কালো কালো মূর্তি।'

—ওরা কারা ?

রামা উত্তর করে, কেউ না। তেনার চেলাচামুণ্ডা। ওদিন ওদেরও যে গাজন থাকে। সারা বছরে মোটে তো একটা দিন!



বেধে গেছে। আর রক্ষে নেই। হয় এ জিতবে নয়তো ওরা জিতবে।

আশপাশে খুব যে একটা বন-জঙ্গল—তা ঠিক নয়। জায়গাটা কয়েকটা বাড়ির সামান্য আড়ালে। পশ্চিমদিকে মল্লিকদের বাঁশের ঝাড়। পুবপাড়ে শনের ভুঁই। আর এদিকে মধুদের বাড়ি। কিছু নারকেল কিছু সুপারী ও কয়েকটা তালগাছের মাথা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় ভাটিবন। ওইসব গাছে চমৎকার ফুল ফুটে রয়েছে। তা, এসব ব্যাপার হচ্ছে কিন্তু অনেক ওপরে, সেই নারকেল গাছের মাথার দিকে। ঝলকে ঝলকে শালিখ দুটো দাঁড়াস সাপের মাথায় গিয়ে ছোঁ মারছে।

সকালবেলা। সাপ বাছাধন গর্ত থেকে বেরিয়ে দিব্যি কিন্তু পোকামাকড় ধরছিল। এক আধটা ব্যাঙও যে না গিলেছে এমন নয়। ওই যে কথায় বলে না—খেতে খেতে গলা, আর বাইতে বাইতে নলা। তা দাঁড়াস বাবাজিরও বলতে গেলে অনেকটা সেই দশা। কেন যে গেল ওখানে! আর গেলিই যখন তখন না হয় একটু গাছ বেয়ে নেমে আয়। শরীরটাও ভালো থাকত। তা নয়, পাখির ডিম খাব। বাচ্চা খাব। খাও! —এমন কিছু মনে করেই এদিক ওদিক শুঁকেটুকে জিলিক মারার মতন সরু জিভ বারকয়েক বের করেই গা ঝাড়া দিয়ে লেবুগাছে উঠল। সেই ভারে লতাপাতা নুয়ে পড়ল খানিক। মা শালিখটা তখনও কিছু বলল না। দাঁড়াসটা এদিক ওদিক মুখ বাড়িয়ে আবার নেমে পড়ল। পড়েই নারকেল গাছ বেয়ে সোজা উঠতে লাগল।

মা শালিক তখনও পর্যন্ত কিন্তু চুপচাপ দেখেই যাচ্ছিল। যখন দেখল এ তো সুবিধের নয়, তখন দাঁড়াসের সামনে এসে একটা চক্কর দিয়েই ফুড়ুৎ। অর্থাৎ সবুর করো। মজাটা টের পাবে।

সাপ তখন অনেকটা উঠে গেছে। আর একটু এগোলেই পাখির গর্ত। বোঝাই যাচ্ছে গন্ধ শুঁকে শুঁকে যাচ্ছে। যাবে না কেন? রোজ সকালে উঠে একবার করে ভেবে নেয়--আজ কোন্ বাগানে যাওয়া যায়। কোন্ পাখির ডিম খেতে সুস্বাদু। এই কথা মনে রেখে বাগানের ভেতর দিয়ে শুকনো পাতার ওপর মচমচ শব্দ তুলে এগোয়। আর চলার পথে যদি বড় একটা কোলা ব্যাঙ ভয়ে পালিয়ে যায় তখন দাঁড়াসটা যে করেই হোক তাকে ধরবেই। তাকে গিলেটিলে পেট মোটা করে কোনও এক খোলা জায়গায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করে তারপর গর্তে ঢুকবে। কেননা, ওই বড় ব্যাঙ খেয়ে আর কিছু খেতে পারে না। কিন্তু যেদিন না পাওয়া যায় সেদিন এসব কুবুদ্ধি নিয়ে এগোয়।

আজ ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে। তাই শরীরটায় কেমন একটা আলসেমি আলসেমি ভাব। তবে মধুদের খড়ের তলাকার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে এর মধ্যে যতটা খাওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু নেহাৎ কম হয়নি। ভালো রকমের টিফিনই বলা যায়।

এতক্ষণে ঠিক জায়গায় এসেছে। গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে আবার বের করে আনল বাইরে। আঃ! কী মিষ্টি ডিম। নয়তো কচি বাচ্চার মাংস। জিভে জল এসে যায় জুৎ। করে এবার আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকবে। ঠিক এমন সময় সঙ্গী শালিখ এসে গেছে। দাঁড়াস কিন্তু টের পায়নি। এসেই কোপাকুপি। অর্থাৎ পালা করে ঠোক্কর। শালিখ দুটোর মুখ দিয়ে রাগ বেরোচ্ছে। খ্যা খ্যা।

বারকয় ঠোক্কর খেয়ে সাপ একটু নিচের দিকেই নেমে এল।

নেমে এলো মানে পালিয়ে যাওয়া নয়। কম কথা না। ধারঅলা পাখির ঠোঁট। কয়েক জায়গায় চিরেও গেছে বইকি। ব্যাথা পেয়েও ভাবে—আহা, বড় সুস্বাদু!

কিন্তু এসব কি কোনও মা-বাবা সহ্য করতে পারে? হোক না সে শালিখ পাখি।

আসল কথা এমন বাচ্চা কিংবা ডিম খেয়ে খেয়ে দাঁড়াসের বেজায় রকমের লোভ এসে পড়েছে। ফাঁক পেলেই গাছে চড়ে বসে। খুঁজে দেখে কোথাও কোনও পাখির বাসা আছে কি না। অন্য জায়গায় এদ্দিন যে চুপিসাড়ে গিয়ে খেয়ে এসেছে। পাখিরা সব আধার খেতে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখানে যে কদিন আগে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে এমন অবস্থায় দু'জনে কি ফেলে রেখে যেতে পারে? না, যাওয়া উচিত? তাই একজন খাবার আনতে গিয়েছিল। অন্যজন রয়েছে পাহারায়। সেটা কি মোটা মাথার সাপ বুঝতে পারে! ভেবেছিল এখানেও ফাঁকা থাকবে। কিন্তু তা আর হল কই!

একেই পরের জায়গায় বাস করা। তার ওপর নানান শত্তর আছে চারদিক। আরও বড় কথা তাদের বাচ্চা হয়েছে। বুড়োনি পাহারা দেয় আর বাবা শালিখ একটুখানিক খাবার পেলেই ফুড়ৎ করে চলে আসে। কিন্তু আজ যেভাবে দেরি হয়েছিল, তাতে চিন্তার কথাই বটে। হয়তো ধারেকাছে কোনও খাবার পাচ্ছিল না। তাই।

মা শালিখটা একটুখানিক ঘর থেকে বেরিয়েছিল। কতক্ষণই বা আর ওই অন্ধকার গর্তে বসে থাকা যায়! তাই খুব হালকাভাবে পাখনা-দুটো মেলে দিয়ে নিচে নামল—লেবুগাছের মগডালে। তার মধ্যে এসব হবে কে জানে? তা মোকাবিলা হচ্ছে যখন হোক।

একেবারে জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছে শালিখ দুটো। দাঁড়াসের

অমন জায়গায় গিয়ে কিছু করাও নেই। নিচে, মাটিতে হলে কার কত শক্তি তখন কিন্তু বলা মুশকিল ছিল। এ জায়গা যে বড্ড বেয়াড়া। তাই বাধ্য হয়েই ওদের ঠোক্কর খেতে হচ্ছে! দাঁড়াসের অমন নাদুসনুদুস শরীর ফুঁড়ে রক্ত ঝরে। অনেকটা নেমেও এসেছে। আর মাত্র হাত ছয়েক। তখন এমন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে পড়বে না তখন শালিখদের সাধ্যি নেই খুঁজে বের করে। আর বেশি ঝামেলা করে নিচের বাগানে গিয়ে যদি সাপকে তল্লাস করতে যায় তখন গপ্ করেই গিলে ফেলতে পারে দাঁড়াস।—এমন কথাও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। মাথাটাও কেমন ঘুরছে। গলাটা তুলে এবার চেষ্টা করল নিজেকে বাঁচাতে। পারল না। একদম না। ধপাস। যেন একটা বেল পড়ল মাটিতে। একদম মটরক্ষেতে।

মটরক্ষেতটাও বেশ বড় সড়! গাছগুলোও নাদুসনুদুস। চট করে কেউ ধরতে পারবে না যে এর মধ্যে এক কাহিল দাঁড়াস পড়ে আছে। এক্কেবারে তালগোল পাকানো।

শালিখ দুটোর তো এসময় আনন্দ হবারই কথা। ওরা আনন্দের চোটে বাচ্চাদের পালা করে সোহাগ জানিয়ে আসছে।

এরমধ্যে বুরোনিটা এক কাণ্ড করে বসল। হালকাভাবে উড়ে এসে ভাটিপাতায় বসে খোঁজাখুঁজি করছে সাপকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। আবার অন্যগাছে গেল। গিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে মনে হল ক্ষেতের একটা গাছ নড়ে উঠল। হ্যাঁ, যা ভেবেছে ঠিক তাই। শ্রীমান মাথা তোলবার চেষ্টা করছে। এমন সময় দুষ্টুমি করে কাছাকাছি একটা গাছে বসে রইল। তার দিকে নজর রেখে চুপিচুপি একসময় জিজ্ঞেস করল—কী, ব্যাথা পেয়েছো? বলেই আবার ফুড়ুৎ। অর্থাৎ, বাচ্চাকে দেখতে চলল।



চেনিরদ্দির বিপদ

গুরুপদ কামারের দোকানের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদছে লোকটা। 'হায়, হায়, আমার পাট-বেচা টাকা'।

বিস্তর লোক জমেছে। সব শুনেটুনে একজন বলল—বুঝেছি, হজিপুরের চেনিরদ্দির পাল্লায় পড়েছিলে ? যে ওর ফাঁদে পড়েছে সে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। এক নম্বর ডাকাত। খবরদার, আর যেয়ো না বিনি-পয়সার ভেল্‌কি দেখতে। বাক্সে জাদু থাকে। সাবধান!

লোকটা চোখ মুছে বলল, আমি কত ক'রে বললাম—চাচা, আমার ঘাট হয়েছে। কিছু টাকা ফেরত দাও অন্তত। তখন বলে কি না কিসের টাকা। ছিনিয়ে নিয়েছি ? আপনা-আপনি দিয়েছো। পাঁচটা লোক ডাকো, বিচারে পাও তো দেব। বলে কি না তার চেয়ে বরং তাবিজটা নিয়ে চালের বাতায় গুঁজে রাখো, পয়সা উসুল হয়ে আসবে।

এসব শুনে হাটুরে লোকজন মাথা গরম করে বলে—সে গেল কোথায়, চলো দেখি!

'এই লাগ লাগ, ভেল্‌কি লাগ। হাটে লাগ, মাঠে লাগ। আমার দুই চক্ষু বাদে যে যেখানে দাঁড়িয়ে তার চোখে-মুখে লাগ।' ডুগ ডুগ ডুগ···

বাঁ হাতের কাঠিটা দিয়ে গণ্ডি কাটে চেনিরদ্দি। ধানো-হাটায় এবারও লোক হুমড়ি দিয়ে পড়েছে। মাটিতে লাল সালুর ওপর সেই বাক্স। তাতে হেলান দেয়া সাতদোঁহার সাধু।

'স'রে একটু স'রে ভাই। বাচ্চারা গোলমাল করবে না একদম। এই দেখুন দুটো গুলি। আর এই হল কাঠের ঢাকনি। আমার বাঁ হাত ফাঁকা। এইবার কীভাবে এই গুলি আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে যায়, দেখুন—'

বাবু-আসনে বসে আছে চেনিরদ্দি। একটা সিঁদুর মাখানো হাড় ছুঁয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল—আলবিশ, তালবিশ—ফুঁ ঃ।

কাঠ তুলতেই দেখা গেল হ্যাঁ, বাবুরা জোড়াসন হয়ে বসে আছে। কী করে হল ?—সবাই তো একেবারে তাজ্জব।

'আরও আছে। এবার দেখুন, ফুঁঃ। এই ছুঁড়ে দিলাম। হাত ফাঁকা। কিছু আছে কি ?'

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

—কী ব্যাপার ! সব চুপচাপ আছেন কেন, ভাইসব। —কথা বলুন। বলেটলে চেনিরদ্দি বিজ্ঞের মতন হাত নামিয়ে টানটান হয়ে গোল হয়ে দাঁড়ানো লোকদের মাঝে একদম দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাঁটুগেড়ে বসেছিল কয়েকটা বাচ্চা। তাদের মধ্য থেকে একটা ছেলে বলে উঠল—না। কিছু নেই।

চেনিরদ্দি উৎসাহ পেয়ে নড়েচড়ে দাঁড়ায়। বলে, এই তো ! মাঝে মাঝে মুখ খুলবেন। আর, আমার খেলা যে হাতেনাতে ধরতে পারবেন তাকে একপেট মিষ্টি ! —না, মিছে কথা নয়। নগদানগদি খাবার।

'এবার দেখুন, ফুঁঃ। —এই ছুঁড়ে দিলাম। হাত ফাঁকা। কিছু আছে কি ?'

—নেই। এবার বেশ কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল।

কথাটা শেষ হতে না হতেই একটা বাচ্চা ছেলের নাক ডলতেই বেরিয়ে এলো গুলিটা।

দেরি করা ঠিক নয়। চেনিরদ্দি ভাবে, ব্যাপারীরা ধান বেচবে। তা ছাড়া আগেকার তরকারি-হাটায় লোকটা বেজায় কাঁদছিল। এখানে এসেও হামলা দিতে পারে। তাই জলদি জলদি লেকচার দেয়—ভদ্র মহোদয়গণ, আমি সামান্য মানুষ। দশ ভাইয়ের উপকার করে বেড়াই। যা বলছিলাম, শুনুন। গলা-খাঁকারি দিয়ে সবার নজর কাড়ে সে। তারপর বলে, আমার এই কৌটোয় যা আছে, তাতে দশব্যক্তি উপকার পাবেন। তবে হ্যাঁ, কৌটো বন্ধ করলে যদি কেউ এক'শ টাকা দিয়ে মাথা কুটে বলেন—আমার চাই। হবে না। হবে না। —ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আগে গুনাগুণ শুনুন—

ভারি ওস্তাদ মানুষের মন টলাতে। যখন বুঝতে পারে লোকরা তাকে বিশ্বাস করছে, তখনই চেনিরদ্দির আসল খেল্।

চেনিরদ্দি লোক চিনে চিনে যাদের কাছে পয়সাকড়ি আছে এমন লোকের কাছেই কৌটো এগিয়ে ধরে। 'যে কোনও একটা পুরিয়া তুলে নিন। সব বিনা পয়সায়। উপকার করতে গিয়ে পয়সাকড়ি নিই না।'

লোকগুলো খেলা দেখতে গিয়ে বেশ মজে গেছে। আর কথা-বার্তায় বেশ ভালই মনে হচ্ছে। এমন ভেবে বেশ কয়েকজন কৌটো থেকে পুরিয়া তুলে নিয়েছে।

চেনিরদ্দি বলে, সব হাতের মুঠোয় বন্দী করে রাখুন।

—আর কে নেবেন ? ডুগডুগ করে আর একবার ডুগডুগি বাজিয়ে বলে, জবান এক ; একবার যদি বন্ধ করে দিই তাহলে যদি আমার ঠাকুদ্দা এসেও বলে আমার একটা চাই, অসুখে কষ্ট পাচ্ছি। তবুও হবে না, হবে না।

দু'একটা আর যা ছিল সেগুলোও দেখতে দেখতে বিলি হয়ে

গেল। চেনিরদ্দির ডিবে-কৌটো ফাঁকা। তারপর সে আঙুলের কর গুণে সব বুঝিয়ে দেয়। 'কারও মাথায় যদি উকুন হয়…' এমন সব পাঁচরকমের উপকার বলে যায় সে।

কল খাটিয়ে চেনিরদ্দি বলে—যদি এর দাম নিই, কারও আপত্তি আছে?

ভিড় থেকে গুঞ্জন ওঠে—এই যে বলল দাম নেবে না, সব ফ্রি!

কিন্তু মানুষের জবান তো! চেনিরদ্দি খুশি-মুখ করে বলে—সাবাশ। কেননা, একজন সঙ্গে সঙ্গে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করেছিল। তার মুঠি বন্ধ করে গায়ে হাত বুলিয়ে দশজনের সামনে 'সাবাশ' দেয়। কিন্তু তারপরেই আর একজনকে গিয়েও ওই এক কথা বলে। সে বের করল একটা চকচকে কাঁচা টাকা। 'সাবাশ'।

—যদি আপনার কাছ থেকেও এক টাকা চাই, দেবেন আপনি?

লোক বুঝেই বলে এসব। দেখাদেখি সে লোকটাও ট্যাঁক থেকে বের করতে যাচ্ছিল, চেনিরদ্দি থামিয়ে দিয়ে বলে—সাবাশ, সাবাশ। বাচ্চারা খুশিতে জোরসে একবার তালি বাজাও। ডুগ ডুগ ডুগ…

চেনিরদ্দির আসল খেলা কিন্তু শুরু হয়নি। বাক্স থেকে অন্য একটা ডিবে-কৌটো বের করে। ডুগডুগির বদলে কৌটো ঝাঁকিয়ে শব্দ তুলল। —এই খোকা, এর থেকে যে কোনও একটা মাদুলী তোল তো! উঁহু, চোখ বুঁজে। এবার একটু হাত রাখুন মাটিতে।

বিকেল হতে চলল। সূর্যের লাল ছায়া নবগঙ্গার জলে চিকচিক করছে। লোকজনের ভিড়ভাট্টায় গমগম করছে মাগরোর হাট।

'বাবাজির কিরে লাগে। কারও হাত যদি তুলোরাশি হয় তাহলে জলদি করে পৌঁছে দাও এই তাবিজের কাছে। —দোহাই বাবাজি!'

মাটিতে সারি দেয়া হাত পাতানো। চেনিরদ্দির কথা শুনে একটা

হাতের পাঞ্জা ধানো-হাটার মাটি বেয়ে তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। —দেখুন। বাবাজির স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ। এর শক্তি নিজের চোখেই দেখে যান।

এক তুই তিন চার। কত কঠিন কঠিন রোগের নাম করে চেনিরদ্দি বলে, এই তাবিজ একুশ দিন চান করে--মুসলমান হলে আল্লাহ-তালা, আর হিন্দু হলে মাকালীর নাম স্মরণ করে তাবিজ-ধোয়া জল খেলেই মুক্তি।

লোকজন সব মোহিত হয়ে শোনে। চেনিরদ্দির কথায় বুঝি জাদু মাখানো। মুখে মৌলভীর মতন দাড়ি। আঙুলে নানান রঙের আঙটি। সেই আঙুল তুলে এবারও বলে, সত্যিকারের প্রয়োজন হলে তাঁরাই চাইবেন। বেশি নেই।

উকুনের ওষুধেব মতন দেখা গেল তারাই হাত পেতেছে, যাদের যাদের চেনিরদ্দি 'সাবাশ' বলেছিল।

দেয়াটেয়া হয়েছে। আগের বুলি ধরে বলে, যদি পাঁচ টাকা দাবি করি? লোকগুলো ঘাড় কাৎ করে। 'নিন'।

'সাবাশ!' ছয়জনের কাছ থেকে কিছু কিছু করে চেয়ে তাবিজ আর এক টুকরো লাল-কারসহ তাদের টাকা-পয়সা হাতের মুঠোয় বন্দী করে দেয়।

চট হাতে এক ব্যাপারি ভিড় ঠেলে উঁকি দেয়। 'জলদি সরো। হাটের সময় দোকান লাগাতে দাও।'

চেনিরদ্দি তাড়া খেয়ে বুঝল সত্যি সত্যি হাটের সময় হয়ে গেছে। ওদিকে দরবেশ মিঞার ধানের কল 'ভট ভট' স্টার্ট নিয়েছে। এবার প্রথমজনের কাছে গিয়ে মিটিমিটি হাসে। 'তা ভাই, যদি আপনার এই টাকা নিই?'

লোকটা প্রথমবারের কথা চিন্তা করল। 'ও তো নেবে না; মিছেই বলছে।' সেই কথা মনে রেখে ঝপ্ করে ঘাড়টা কাৎ করে।

—দেখুন, এতজনের কাছে কবুল করলেন কিন্তু।

লোকটার কাঁধে হাট করার ধামা। 'ঠিক আছে, আপনি নিয়ে নিন।'

'সাবাশ'। চেনিরদ্দি এমন করে কমবেশি সবার কাছ থেকে যে টাকা পাবে তাতে মনে মনে হিসেব কষে—টাকা পঁচিশেক হয়েছে। তারপর সকলের সামনে শেষ কড়াল দিয়ে সবে প্রথম-জনের টাকাটা নিয়েছে, এমন সময় হৈ-হল্লা, চেঁচামেচি।

—এই রে! সেরেছে। বোধহয় সেই আগেকার লোকটা লোকজন জুটিয়ে এনেছে। 'দিন ভাই। তাড়াতাড়ি দিন।' চেনিরদ্দি কৌশল করে বলে, আমার টাবুরে নৌকো ছেড়ে দেবে। বাড়ি যাব।

লোকগুলো চেনিরদ্দির এই কথা শুনে বড্ড মনমরা হয়ে গেল। অনেকের তো বুক রীতিমত কাঁপছে। ধড়াস। ধড়াস। কিন্তু কিছু করার নেই। বলতে গেলে মান থাকবে না। কথা যখন দিয়েছে পাঁচজনের সামনে, তখন দিতেই হবে। দিলও সব বাধ্য হয়ে।

তারপরের কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি সারতে লাগল চেনিরদ্দি। মড়ার খুলি, লাল সালু, ডিবে-কৌটো সব বাক্সবন্দী করেই ভিড়ের মাঝে বিলি কাটতে কাটতে ধানকলের গলি ধরে ধাঁ।

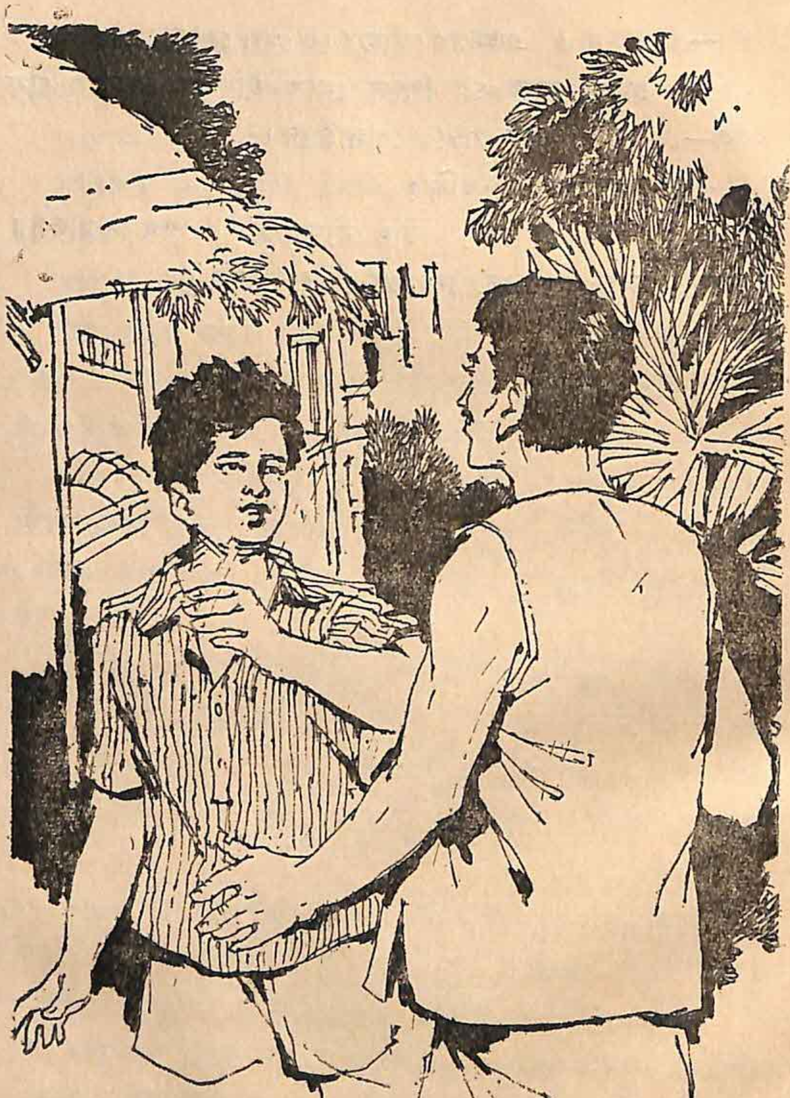
মানুষজন চিন্তা করে, ব্যাপার কী? কেননা, যাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল তারা এখন এখানে এসে পড়েছে। কয়েকজন এসে উঁকিঝুকি মারছে। —কী ভাই?

—কিছুই না। একনম্বর জোচ্চর। গেল কোথায় ?

এক হাটুরে-লোক ওই পিছন থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল—দে, দে। ওকে হাটুরে ধোলাই দে।

—কোথায় গেল চেনিরদ্দি ?

সে কি এখন থাকে! ডিঙি নৌকো চড়ে এতক্ষণ সে হজিপুর ধরেছে। 'বড্ড দেরি হয়ে গেল গো! বড্ড দেরি!'



হাটের দিন

আর বোধহয় ঘুরতে হবে না। বটতলা, বড়জোর তেঁতুলতলার রবিদের বাড়িই পাওয়া যাবে। পদ-মাস্টার এর বেশি যেতে পারেন না। অসম্ভব ব্যাপার।

পদ-মাস্টার হচ্ছেন গাঁয়ের কালিপদ রাহা। সপ্তায় মোটে চারটি হাট। মাগরো হাট হল গিয়ে রবি আর বিষ্যুদবার! কাঁটাখালি ও হাওড় মিলিয়ে আর দুটো। তাই অন্য দিনগুলো কি শুধুশুধু বসে থাকতে পারে কোনও লোক?

দোকানদারি করেন বলে একেবারে মুখ্যু তো নন। আর ব্যবসা তো স্বাধীন রোজগার। পদ-মাস্টার তাই ছাত্তর পড়ানো শুরু করলেন। আজ হচ্ছে কাঁটাখালির হাট। যেতে হবে অনেক দূর বেলাবেলি মাঠ দিয়ে বড় রাস্তা ধরতে হবে। তারপর লোহার পোল। ধানকল। পাশ দিয়ে খালের মতন একটা নদী বয়ে গেছে। ওইখানটা কাঁটাখালির হাট বসে। ছোট ছোট খড়ের চাল। কামারশালা। হাট যখন পুরোদমে বসে যায় তার মধ্য থেকেও ঠকা-ঠক হাতুড়ির ঘা শোনা যায়।

রতন খুঁজতে বেরিয়েছে মাস্টার মশাইকে। বাড়ি এসে পাননি তিনি। পাবেন কেন! সে তো দীপুদের ঢেঁকিঘরের পাশে মাটি পরিষ্কার করেটরে পরির সঙ্গে গুলির দান দিচ্ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ এমন সময় বাবা যে ডেকে উঠবে কে জানত তা। ডাকটা কানে যেতেই হয়ে গেল!

এমন সময় গলা ছেড়ে ডাক মানেই পদ-মাস্টার পিঁড়েয় বসে আছেন, নয়তো রবিদের বাড়ি পড়াতে গেছেন। কেননা, আগে রতনদের বাড়িই আসেন মাস্টার মশাই। তারপর রবি আর সবশেষে বাবলু। তাই একবার যদি ডেকে না পান তো চোখ ঘুরিয়ে বাড়ির এদিক ওদিক দেখবেন। তাতেও যদি না পান তবেই অন্য বাড়ি। যদি একবার সীমানা ছেড়ে চলে যান তাহলে পরের ব্যাপার সবাই জানে।

রতন তাই বাড়ি না ঢুকে দীপুদের খড়ের গাদার আড়াল থেকে ঘর, বাড়ির উঠোনটাকে ভালমতন একবার দেখে ঘুরপথে একদম বটতলা। রবিদের বাড়ি থেকেই আওয়াজটা আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বরোজের পাশ দিয়ে যেতেই শুনল রবি 'ওই দেখা যায় তালগাছ' পড়ছে।

আজ হয়তো ঘা'কতক বেশিই পড়বে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলে অতটা লাগে না নাকি। তাতে ফল যে একদম পাওয়া যায় না তেমন নয়। তবে মার খাওয়ার পরে পিঠ বা হাতেটাতে পষ্ট দাগ বসে যায়।

বাবা এখনও ডেকে যাচ্ছেন। রতোওন···। সেই থেকে চলছে। একবার পুবদিক। খানিক বাদে পশ্চিম। আস্তে আস্তে গলাটা সরু হয়ে গেছে। এখন যদি বাবাকে গিয়ে বলা যায় 'মাস্টার মশাইকে ডাকতে গেছিলাম' তাহলে ঘোর বিপদ। রতন দাঁড়িয়ে রইল বরোজের পাশে। ঠিক কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

আবার যদি দাঁড়িয়েই থাকে তবে রবিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাস্টার মশাই কানের ঝুলপি উলটো টেনে বলবেন—কোথায় ছিলে, বাঁদর ?

বাবার ডাক শোনা যাচ্ছে না। এপাশ ওপাশ আঁশশ্যাওড়ার ঝোপ। বাঁশবাগান। দক্ষিণে বিরাট দীঘি। বেলা শেষের আলো অনেক কম। তেঁতুল গাছের ছায়া পুবদিক হেলে পড়েছে। পদ-মাস্টার বেরিয়ে আসছেন।

ছিপছিপে কালো শরীর। পান-খাওয়া সামনের দাঁতদুটো বেরনো। পরনে ধুতি। গায়ে ফতুয়া। মাস্টার-মশাই রবিদের রান্নাঘরের কানাচি বরাবর আসছেন। তারপর ছোট্ট গলিতে পা পড়তেই বাদল সা দাওয়া থেকে সাড়া নেয়। 'মাস্টার মশাই আমাদের বাড়িটা ঘুরে যাবেন।'

সামনে রতন। ওপাশে বাদল সা। 'বাবলুটাকে একটু দেখিয়েই যান। চাড্ডি খেয়ে নিই। আর আপনার মাইনেটাও নিয়ে যাবেন।'

বাদল সা ভাত চটকে নিয়েছে। পদ-মাস্টার বেজায় রকমের চোখ গোল্লা করে বললেন, এক্ষুনি আসব। পড়তে বসো গে, যাও!

রতন ধমক খেয়ে একটু এগিয়ে গেল বটে কিন্তু পুরোপুরি বাড়ির রাস্তা দিয়ে নয়। কোন্ মুখে বাড়ি যাবে? একা একা গেলে নিস্তার থাকবে না। একেই মার শরীর খারাপ। অন্য কেউ নেই যে তাকে মারের হাত থেকে ঠেকিয়ে দেবে! আর যদি মাস্টার মশাইয়ের একটু আগে আগে গিয়ে বাড়িতে ঢোকা যায় তাহলে হয়তো টুকিটাকি একটা মার হতে পারে। আর তারপর নিশ্চয় মাস্টার মশাই হাটের তাগাদা থাকতে বেশি হুজ্জোতি চাইবেন না। তারচেয়ে বরং একটু আড়ালে ওই মাদার-গাছতলা দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। এখান থেকে বাবলুদের বারান্দাটাও পুরোপুরি নজরে থাকবে।

পদ-মাস্টার আসন-গেড়ে বসতেই বাদল সা বলল—আর বলবেন না। আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে না!

—ঠিকই বলেছেন। হাড়-হারামজাদা। কাউকে ঠিক সময় ঘরে পাওয়া কি যায়? —এই দেখুন। আজকে তো বেশ বেলা হয়ে গেল।

দোকানদারির কথা না বললেও ওটা সবাই জানে। এতসব কথাবার্তার মধ্যে বাবলুর পড়ার কী কায়দা!

রতন এদিক ওদিক চেয়ে গুলিগুলো ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে রেখে বেশ খানিক দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনতে পেল—'এখান থেকে এইটুকু।'

পদ-মাস্টার টায়ারের চটি পায়ে দিয়ে উঠোন অব্দিও আসেন নি। বাদল সা ভাতটাত খেয়ে কাঠি দিয়ে বারান্দার কোণে বসে আরাম করে চোখ বুঁজে দাঁত খিলোচ্ছিল। কথাটা শুনে এঁটো পাঞ্জা দেখিয়ে বলল—এই দেখুন মাস্টার, হাতের এঁটো এখনও শুকোয়নি।

মাস্টার কিন্তু কথাটা বুঝতে পারলেন। অবাক হলেন না। এ তো নতুন নয়।

—হয়ে গেল আপনার পড়ানো? অন্যদিন বাড়ি থাকি নে। তা এমন যদি···

বেশি বাজে বকার সময় নেই। ওদিকে বোধহয় হাট বসতে শুরু করেছে। এখনও রতনকে পড়ানো বাকি। তাই অল্প কথায় সেই কথার জবাব দিয়ে বললেন, আপনি কত দেন বাদলদা?

—একথা কেন?

—বলি, মাসে মাইনেটা কত দেন?

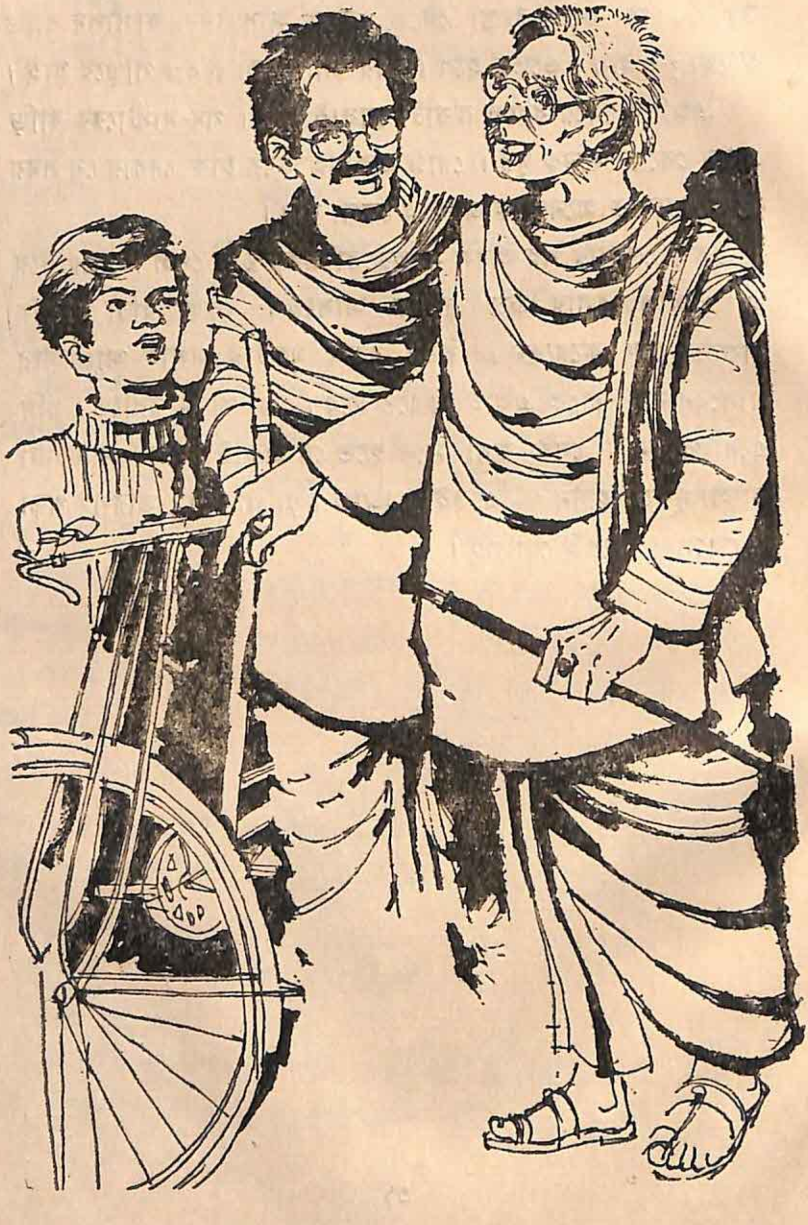
—৫ টাকা!

এই কথা বলার পর পরিষ্কার হেসে না ফেললেও মুখে একটু রসিকভাব করে বলেন, আপনাকে আরও আট আনা বেশি দেবো।

শুধু একবার করে রাস্তা থেকে ডেকে আসবেন—কালীপদ বাড়ি আছো ?—ব্যস ! ওতেই হবে। আর আমি তো ছু'দণ্ড পড়িয়ে যাই।

একদিক দিয়ে ধরলে কথাটা ন্যায্যই বটে। পদ-মাস্টারের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর। রোজ একবার করে হাঁক দেবার যে সময় নষ্ট হবে তাতে অনেক কাজ করে ফেলা যায়।

একথা শোনার পর বাদল সা হয়তো একটু ছুঃখ পেল। পেয়েটেয়ে আরও কীসব বলার জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাবা আবার ডাকতে শুরু করেছেন। রতন বুঝল মাস্টার মশাই আজ আর আসবেন না তাকে একাই ফিরতে হবে। যা থাকে বরাতে। যদি এসে পড়েন! সেই কথা মনে হতে সে একাই চলল। নামতাটা ভালো মুখস্ত হয়নি। একেই মেজাজ চড়া থাকবে ; তারপর পড়া না পেলে ছু'দিকেই ধোলাই।



পরীক্ষার ফি

দাদুর বড্ড ভুলো-মন। কাউকে কিছু দিলে ফেরত নিতে খেয়াল থাকে না। আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয়। এক এক সময় তা নিয়ে এমন ঝামেলা হয় তা আর কী বলব। পরে দাদু বুঝতে পারে, তখন জিভ কামড়ে বলে—ইস, একদম ভুল হয়ে গেছে।

একবার পরীক্ষা নিয়ে বেজায় ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। দাদুর খাতিরে পরীক্ষা বন্ধ হবার জোগাড়। যাদের যাদের ফি জমা দেয়া আছে, সেইসব নাম রোলকল করার মতন বলে দিলেন্ সতীশ স্যার। তার মধ্যে আমার নাম শুনতে পেলাম না। অথচ দাদু যে বলল ফি জমা পড়েছে।

আজ বাদে পরশু অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সবাই অ্যাডমিড কার্ড পেয়ে গেল। স্যার বললেন, আজ ছুটি। ঘরে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করোগে, যাও।

'ছুটি ছুটি।' ছেলেমেয়েরা দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের স্কুলের সামনে বড় মাঠ। এই দরমা-ঘেরা বড় ঘরটায় ক্লাস ফোরের 'এ' সেকশন 'বি' সেকশন মিলেমিশে ক্লাস হয়। ঘরটা রাস্তার পাশে। পাশেই কালিগাঙ। পাকুড়গাছ। পাটনীর চালাঘর। নদীর ওপারে নতুন বাজারের ঘরগুলো সারি দিয়ে দাঁড়ানো। কেউ কেউ বাড়ির দিকেই গেল, কেউ বিরাট মাঠে খেলাধুলো করছে। আমার ফি জমা পড়ে নি। স্যার খাতাপত্তর নিয়ে গুটিগুটি পিঠে রোদ্দুর নিয়ে মাঠের ওপাশে যে সব ক্লাশ হয়,

স্যাররা বসেন, সেখানেই যাচ্ছেন। ইচ্ছে হল গিয়ে বলি, আমি নারায়ণ বিশ্বাসের নাতি। ওই যে হরিপদর দোকানে একসঙ্গে বসে চা খান—সেই বাড়ির কানাই আমি। কিন্তু বললাম না। স্যার কী মনে করবেন শেষে।

বাড়ি ফিরেই জিজ্ঞেস করলাম। দাদু অবাক হয়ে বলল, সেদিন যে তরকারি-হাটায় দেখা হতেই তোর ফি দিয়ে দিলাম। মাস্টার-মশাই নাম লিখে নিলেন। —ঠিক আছে, সন্ধেবেলা দেখা হবে তখন বলব।

দাদু কেমন যেন গা করল না। রাত পোহালে পরীক্ষা, সেখানে কি না জমার ঘর ফাঁকা। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল। পড়াতে কি মন বসে! মাকে গিয়ে বললাম,—তুমিই ফি-টা দিয়ে দাও, এক দৌড়ে স্যারের বাড়ি দিয়ে আসি।

এ কথায় মা রাগ করল না। কিন্তু দাদুকে বলতেই এক তাড়া দিল আমাকে। 'বলেছি তো, আর একটু বাদেই যাব।'

বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বারান্দায় বসে মা কাঁথা সেলাই করছে। মশাগুলো ভন্‌ভন কুঁউউ শব্দ করে কানের পাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। আমি পদ্য মুখস্ত করছি। কিন্তু পড়লে কী হবে, মন রয়েছে ভোম্বলের ওপর। কুকুরটা কখন ডেকে উঠবে। তারপর যখন দেখবে দাদু এসেছে, তখন চুপ করে গিয়ে লেজ নাড়াবে। কাঁইকুঁই আদর চাইবে—তাহলেই বুঝব দাদু।

রাত তখন অনেক। হ্যারিকেনের কাঁচে কালি পড়ে গেল। দাদু আসছে না। মা একবার হাই তুলে বলল, পড়া হয়েছে? চল্ খেতে দিই।

তবুও দাদু আসছে না। না দেখেদেখে খেতে দিয়েছে মা, এমন সময় ভৌ ভৌ। ভোম্বল ডেকে উঠেই চুপ! দাদু পেয়ারাতলা দিয়ে আসছে। খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ফি-এর কথা।

দাদুর বিরস মুখ। 'দেখা হল না রে। মাস্টার আজ চা খেতে আসেন নি।'

তাহলে? এখন উপায় কী হবে? মনে মনে বললাম। আমার মুখ-গোমড়া দেখে বলল, কাল সকালে তোর সঙ্গে স্কুলে যাব। ফি জমা না পড়লে আবার দিয়ে দেব। চার আনার ঝামেলা তো!

সকাল সকাল সাঁকো পেরিয়ে পাটনীর চালায় বসে আছি। সতীশ স্যার সাইকেলে চেপে এ পথেই আসবেন। স্যারের বাড়ি যদিও আমাদের গাঙকূলের ঘাট সোজাসুজি, তবুও দাদু বটতলা না দাঁড়িয়ে সোজা এখানেই চলে এলো। একটু ওপাশেই স্কুল। দাদু এক এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রশ্নগুলো, কেমনভাবে লিখতে হবে। এমন সময় আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—দাদু!

দাদুকে কিছু বলতে হল না। সতীশ স্যার সাইকেল থেকে নেমেই আশ্চর্যভাবে বলেন—দাদা, তুমি এখানে?

মিটিমিটি হাসছে দাদু। 'মাস্টার মশাই, আপনার লিস্টি খুলে দেখুন তো।'

—কী হয়েছে, দাদা?

—সেদিন তরকারি-হাটায় পরীক্ষার ফি-টা দিলাম। কিন্তু নাতি বলছে ওর নাকি নাম নেই। অ্যাডমিড কার্ড পায় নি।

শীতকাল। সবে চান করে এসেছি। রোদ উঠেছে বেশ। তবু গাঙকূলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা। সতীশ স্যার, দাদু ও আমি।

পাশ দিয়ে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। কয়েকটা ছেলে আমাদের দেখে কিছু দূরে গিয়ে আমাদের দেখছে আর কী যেন বলাবলি করছে। উত্তর দিকের বাতাস হু হু করে বইছে। ভেতরে ভেতরে কাঁপছি। সাইকেলটাকে পেছনে ঠেকনা দিয়ে সতীশ স্যার খাতা খুলে নাম খুঁজছেন।

—কোন্ ক্লাশ তো ?

—ফোর। দাদু খাতার দিকে চোখ রেখেই বলল।

স্যার গুনগুন করে একে একে নাম পড়তে পড়তে হঠাৎ থেমে পড়লেন। তারপর দাদুর দিকে চেয়ে জমা-হাসি চেপে কথা বললে যেমন মুখটা হয়, তেমন হয়ে উত্তর দেন—দাদা, এক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

দাদু দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে জানতে চায়—কী, কী হয়েছে ?

—তুমি দেখি ফোরের ছাত্র হয়ে গেছো।

তারপর দু'জনেই একসেঙ্গে হাসতে লাগলেন।

দাদু বলল, মাস্টারমশাই, এবার সত্যি সত্যি পড়তে ইচ্ছে করছে।

স্যার বলেন, নাতিটা পাশ করুক, তারপর। —এসব বলে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

হাসি থামিয়ে দাদু বলল—হল তো! যাও, এবার মন দিয়ে পরীক্ষা দাও গে।

তখন কিছু বুঝিনি। পরীক্ষা শেষ হলে, পাশটাস করার পর একদিন দাদু চুপিচুপি বলল—জানিস, ফি জমা পড়েছিল ঠিকই, তোর জায়গায় আমার নামটা লিখে রেখেছিলেন মাস্টারমশাই।

—ও হোঃ! সেদিন অ্যাডমিড কার্ড দেবার সময় ক্লাশে দাদুর নাম ডাকা হয়েছিল। তাই তো ভাবি—নারায়ণ বিশ্বাস আবার কে ?



গজদুব্বোর সতীশ ভঞ্জ

সতীশ ভঞ্জের জ্বালায় সবাই অতীষ্ঠ। ঘুম নেই কারও চোখে। দূর দূর গাঁয়ের লোক নালিশ লিখিয়ে যাচ্ছে থানায়। মাগুরা, ইছেখাদা, শ্রীপুর, দু'চারজন যেখান থেকেই আসুক না কেন, আর পাঁচটা কথার পিঠে সতীশের নামটা ঠিকই বলছে। হলুদ রঙের থানায় বসে বড় দারোগা চিন্তা নিয়ে মাথা নাড়েন। হুঁ! —সমস্যারই কথা বটে।

সতীশ নৌকোর মাঝি। মানে কালিগাঙ, তীরমুনিতে যেসব ছইঅলা টাবুরে নৌকো ভাড়া খাটে, সেগুলোই চালায় আর কি। ঠিকমতো খাটলে তো হয়, তা না দেখ গিয়ে অনবরত বদবুদ্ধি মাথায় ঘুরছে। চেনাশোনা ঘাটে এসব করে না। বোকাসোকা মাঝিটি সেজে থাকে। আর ভাড়া এলে সেই নিয়ে যায় বেঘোপ জায়গায়। লোকজন বললে বলে, বাবু চোখ বুঁজে থাকুন, ঠিক নিয়ে যাবো। চোখ খুললেই দেখবেন আপনার কুটুম-বাড়ির ঘাট।

কী করবে আর! যাত্রীরাও ভাবে আশপাশে কোনও খালটাল আছে বোধহয়। যেখান দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে। সেই মতন সব থাকে।

গাঙের দুই কূলে পেল্লাই পেল্লাই বাঁশঝাড়, ভাটিবন। পাশ দিয়ে শুশুক উঠছে, নামছে। পিঠ ভাসিয়ে কেমন ডিগবাজি খায়। তারপর তীরমুনি ছাড়িয়ে যখন অনেক দূর চলে যায় তখন বড় গাঙের মাঝামাঝি গিয়ে হঠাৎ সতীশের বোঠেটা উঠে যায় জল থেকে। —

মালকড়ি যা আছে বের করো এইবেলা। নইলে এক এক ঘা দিয়ে জলে ফেলব।

তখন তাদের অবস্থাটা ভাবো একবার। কালো চকচক্ করছে জল। কুমীরটুমির না থাক, এক আধটা কামট থাকলে আর রক্ষে নেই। তার চেয়ে বরং 'এই নাও' বলে দিয়ে দিত সব। সতীশ তারপর আঘাটায় গিয়ে খাগড়া-বনে নামিয়ে সাঁই সাঁই বেগে বাইচ খেলার নৌকোর মতন নিমেষেই অদৃশ্য হয়ে যেত। তারপরই তো চিৎকার-চেঁচামেচি। থানায় নালিশ।

অনেকদিন ধরেই তক্কে তক্কে আছে পুলিশ। গ্রামের চৌকিদার দফাদারও হিমসিম খাচ্ছে। সতীশ নাকি বাড়ি এসেছে। অমনি লোকলস্কর নিয়ে দেখা গেল ঘর ফাঁকা। সতীশের বউ বলে, কই, আসেনি তো! তাতে রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে পুলিশের। অজগাঁয়ের সামান্য এক আসামী, তাকে ধরতে এত মেহনত!

জল-পুলিশও নেমে পড়ল। রাত্তির বেলায় টর্চ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু গেল কোথায়! নাকি নৌকো-বাওয়া ছেড়ে দিল। যাই হোক, এখনকার মতন না পেলেও পুলিশ কিন্তু খুঁজছে। একেবারে বড়বাবুর অর্ডার।

সতীশকে গাঁয়ের লোক সত্যি সত্যিই অনেকদিন দেখে না। অনেক রকম ভয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। কেউ বলে, না, ও ঠিকই আছে। আর আছে এই গ্রাম না হোক আশপাশেই কোথাও।

একবার হল মস্ত চুরি। একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড। নিশুতি

রাত। গোটা পাড়ায় রটে গেল—চোর চোর। চারদিকের কান কাঁপানো আওয়াজে সবাই তো সজাগ।

এদিকে দীপুর মা তো সুর করে কাঁদছে। লোকজন সব জোট বেধে চোর ধরতে বেরিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটা হল নদীর ঘাটে। পাকা রাস্তায়। সবারই এক কথা : চোর বেশিদূর এগোয়নি। —খোঁজ তোমরা। আর পাড়ার কুকুর কিছু দূরের ক্ষেতের সামনে গিয়ে যেন হামলে পড়ছে। ঘেউ ঘেউ।

পাটক্ষেত ভেঙেচুরে কে পালাচ্ছে না! হ্যাঁ, অবিকল কেউ। টর্চলাইট ফেলতেই বোঝা গেল। মাথায় বাক্স। চাদরমুড়ি একটা লোক। যেই না বসেছে আর বাছাধন্ যাবে কোথায়।

—কী চাঁদ! বলতে বলতেই হল ঘা'কতক। তারপর সে কি ভিড়! যত লোক ছিল সব যেন ভেঙে পড়ল একটুখানিক গ্রামের বাড়িতে। সবাই যেন নতুন করে দেখতে চায় সতীশকে।

দারোগাবাবু চুলের মুঠি টেনে বলেন, অ্যাদ্দিন'পর বাগে পেয়েছি। এবার নৌকো ছেড়ে ডাঙায় এসেছো?

সতীশ হল হাজতবাসী। গ্রামের লোকের একটু স্বস্তি হয়েছে। হাটে-বাজারে বলাবলি হল—সতীশ-চোর ধরা পড়েছে।

তা দেখতে দেখতে বেলাও তো বড় হয়। দিনের পর দিন, তারপর মাস। মাস গড়িয়ে বছর কয়েক হাজতে থাকার পর, জেলের ভাত পেটে গিয়ে শরীর হল ইয়া তাগড়াই। মুখভর্তি দাড়ি।

ছাড়া পাবার একবেলা পর লোকে তার দর্শন পেল। পরদিন সকাল থেকেই আর পাত্তা নেই। ভজ্ঞ মাঝি নিরুদ্দেশ।

আবার আলাপ-আলোচনা শুরু হল। নিশ্চয়ই অন্য কোথাও

চুরি করতে গেছে। কথাটা যথাসময়েই থানায় পৌঁছালো। বেশ সন্দেহের কথা। যে মানুষের রোজ একবার থানায় হাজিরা দেবার কথা, সে মানুষ ফের পলাতক! নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে।

তাই সিপাইদের সাবধান করে দিলেন দারোগাবাবু। ভাইসব, হুঁশিয়ার!

গজহুব্বো গ্রামে ফিরল অনেকদিন পরে। তাকে এবার চেনা দায়। —কোথায় ছিলে, সতীশ ভায়া?

সতীশ গম্ভীর। চোখ ঘুরিয়ে বলে, হুম্।

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে নেংটির মতন কাপড় পরা। গায়ে লাল চাদর। কপালে ইয়া বড় গোলাকার সিঁদুরের টিপ।

সবাই ভাবল—যাক, সতীশ এবার সাধু হয়েছে।

আগে থাকতেই সতীশের পায়ে জেমড়ো। প্রায়ই দেখা যেত নরুন দিয়ে পায়ের তলার ফোলা ফোলা শক্ত মাংস কেটে ফেলছে। হাঁটতে গেলে খোঁড়াতে হয়। বউকে এসে বলল, আমি কামরূপ কামাখ্যার রূপান্তর-বিদ্যে শিখে এসেছি।

—সেটা আবার কী?

—চুপ চুপ! সতীশ ফিসফিসিয়ে বলে, জাদুবিদ্যে। মন্তর পড়ে ইঁদুর বেড়াল কুকুর—সবকিছু হতে পারি। আবার ইচ্ছে হলে ছোট খোকাও হতে পারি। —তারপর আরও সব বলে দিচ্ছিল। পরে ভাবল, না। সবকথা ফাঁস করা ঠিক নয়। শুধু বলল, চিন্তা নাই।

সতীশ কামরূপ থেকেও ফিরে এসেছে অনেকদিন হল। শুধু ঘরে বসে থাকলে কি আর পেট চলবে? কিছু তো করতে হবে। তা কী করবে সতীশ? কী-ই বা করতে পারে? নৌকো চালানোও যাবে

না। একটা কাজ করলে হয়। পাশের গ্রাম বা হাটে গিয়ে ভিক্ষে করা। মনে মনে বলে—যাঃ। এমন জোয়ান মানুষকে কে ভিক্ষে দেবে।

মনে যা ছিল এখনও সেই পথেই নেমে পড়ল সতীশ। অর্থাৎ চুরি-বিদ্যে। এবার যাতে না ধরতে পারে সেই কলই তো শিখে এসেছে সে। চোর ডাকাতরাও একটু আধটু দেবীভক্ত হয়। তাই জয় মা, জয় মা বলে নেমে পড়ল।

বিষ্টি-বাদলার মাস সেদিন। টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। এদিকে সতীশের গায়ে ছটফট শুরু হল। এমন একটা দিন, নষ্ট করা কি ঠিক ? অনেক ভেবেচিন্তে যাত্রা শুরু করল সতীশ। মাঝরাত্তিরে চলল পাশের গাঁ ছেড়ে আরও দূরে।

সতীশ কিন্তু কাজটা বেশ পাকা হাতেই করল। বহুদিন এসব করেনি বলে একটু-আধটু হাতটা কাঁপছিল। কিন্তু কাজে নেমে পড়ে সেই ভয়টা একদম ছিল না।

চুরি হওয়া বাড়িতে যা হয় আর কি ! গেরস্তের বউ ঘর খুলতে গিয়ে দেখে দরজা ভেজানো। নিজে হাতে যে মানুষ খিল দিয়ে শুয়েছে সে ঘরের দরজা খুলল কে ? ও মা ! তারপর দেখে ঝুর-ঝুরে মাটি পড়ে আছে। তাতে পায়ের ছাপ পষ্ট। তা দেখে তো মাথা গেল ঘুরে। কাকপক্ষী ডাকার আগেই কান্নাকাটি। এ চুরিতে ফুটো গাড়ুটাও বাদ যায় নি।

দাগী আসামী সতীশ। শুধু সতীশ নয়, তার মতন আরও দু'একজনকে খোঁজা হল। তক্কে তক্কে পুলিশ ভ্যান সতীশের বাড়ি এসে ঘিরে ফেলল।

সবে সন্ধেবেলা ফ্যানাভাত খেয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক হুকো খাচ্ছে,

এমন সময় এইসব হল্লা। সতীশ বলল, এমন অসময়ে এলেন পুলিশ সায়েব! মুখে চতুর হাসি। সিপাইকে বলল, বসুন। গেঞ্জিটা পরে আসি।

উঠোনে ভিড়। লোকজন বুঝি মজা দেখতে এসেছে! পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে বলছে—হাটো সব। ভিড় হাটাও। যাকে বলে রীতিমত হট্টমেলা।

সতীশের ঘর শন দিয়ে ছাওয়া। মাটির বারান্দা। মাটির দেয়াল। সেই বারান্দায় বেশ কয়েকজন পুলিশ। হাতে বন্দুক। ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

সবাই তো দেখছে ব্যাপারটা। সতীশ ধীরেসুস্থে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বউ কান্নাকাটি করছে। এইবার বাছাধনকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। এবার আর রক্ষে নেই।

বেড়ায় লাঠি মেরে পুলিশ বলল—কী হল সতীশ, জামাইসাজ দিচ্ছো নাকি? এত দেরি হচ্ছে যে। কিন্তু, কোন সাড়াও নেই। সতীশের বউ পাশের রান্নাঘর থেকেই কাঁদছে। আবার জোরে জোরে ঘা মারে দরজায়। অথচ সতীশ নেই তো নেই। দরজা ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘর খুলে গেল। গেল কোথায়! এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। ঘরদুয়োর, চৌকির তলা সবকিছু তথ্য-তল্লাশ করেও তাকে পাওয়া গেল না। —ভাইসব তোমরা পাজিটাকে যেতে দেখেছে? সবাই মাথা নাড়ে—না তো! পুলিশ কেন, গোটা লোকজনই এক্কেবারে অবাক।

ভোর রাত্তিরে ভজন চৌকিদার থানায় হাজির। ঘন ঘন সেলাম ঠোকে। স্যার আবার—

দারোগা ধমকে ওঠেন। মানে, তোমরা আছো কী করতে। এই কথা শোনার পর কোমরে বেল্ট-আঁটা চৌকিদার মশাই তো

ভালভাবেই কাঁপতে শুরু করল। গলা দিয়ে আর কথা বুঝি বেরোতেই চায় না।

একজন তো খুব ভয়ে ভয়েই বলল, ও জাদু জানে স্যার।

দারোগার বিশ্বাস—জাদুফাদু সব বুজরুকি ব্যাপার।

—না স্যার। সত্যি ব্যাপার। জাদু করে ইঁদুর হয়ে ঘরে ঢুকে ছুঁমন্তর সব্বাইকে গভীর ঘুম পাড়িয়ে চুরি করে, খুশিমতন এটা ওটা বেছেবুছে চম্পট মারে।

—চোপ! এবার টেবিল চাপড়ে বলেন, যে করেই হোক জ্যান্ত কিংবা মরা—সতীশ ব্যাটাকে হাজির করতেই হবে। যাও, এক্ষুনি যাও—

এমন কায়দার ধমক খেয়ে ফের সেলাম দিল বড়বাবুকে। দিয়েটিয়ে দুই গণ্ডা পুলিশ চলল গজডুব্বোয়।

—হ্যাণ্ডস আপ!

বড় বেকাদায় ধরা পড়ল সতীশ। মন্তর খাটানোর আর সময় কোথায়।

সতীশ তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। পিস্তল দেখে বউ কাঁদে। কেঁদে-কেটে চোখ লাল। তার সেই এক কথা—চিন্তা নাই।

সতীশকে নিয়ে যাবার সময় বউ তো ঠুঁস হয়ে মাটিতে পড়ে। কিন্তু তাতে কি আর হুকুম নড়চড় হয়! রাস্তার দু'ধারে দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। সতীশের হাতে হ্যাণ্ডকাপ। কোমরে দুতিন প্যাঁচের দড়ি ধরে পুলিশরা হাঁটাপথে নিয়ে চলল শহরের থানায়।

সতীশকে পেয়ে তো বড় দারোগা বেজায় খুশি। অনেক দিন এমন করে ভালো লাগে নি। সিপাইগুলো অ্যাটেনশন হয়ে সতীশকে

পাহারা দিচ্ছে। দারোগাবাবু তখন সতীশের সঙ্গে বেশি আলাপ করেন না। চোখ গোল্লা করে বারহুই তাকিয়ে সোজা ঘরে যাবার সময় হুকুম হল—পুরে দাও লকআপে। আবার সেলাম পড়ল। অর্থাৎ, যে আজ্ঞা!

এবার কিন্তু বিকেলও গড়ায়নি। সতীশকে বিকেলের চা দিতে গিয়ে দেখা গেল ও হাজতে নেই। কী ব্যাপার!

ব্যাপার তো বটেই। শুধুশুধু কি আর এতদিন কামরূপ কামাখ্যায় কাটিয়ে এলো!

সি. আই. ডি এসে খবর দিল খেয়াঘাটে কালী ময়রার দোকানে কাঁচাগোল্লা আর পরোটা খাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুপঝাপ করে সব পুলিশ ভ্যানে উঠল! এবার সঙ্গে গেলেন স্বয়ং বড়দারোগা।

আড়াল থেকে দেখে ভাবেন সত্যিই তো! এবার রূপান্তর বিদ্যেয় বিশ্বাস হল দারোগার। আরও তু'টাকার মিষ্টি খাইয়ে বলেন, ভঞ্জ মশাই। তুমি চুরিবিদ্যা ছেড়ে দাও, গরমেণ্ট থেকে পেনশন নাও।

এসব শুনে সতীশ মুচকি মুচকি হাসে। কথাটা মেনে নেওয়াই ভালো। তাছাড়া বয়স হয়েছে। এসব আর ভাল্লাগে না। তাই সুযোগ পেয়ে সতীশ একেবারে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

তবে চোরকে পেনশন দিতে ওপরঅলারা একটু টালবাহানা করছিল বটে, কিন্তু বড় দারোগার লেখালেখিতে পেনশন হল স্যাংশন।

সেই থেকে মাস ফুরোলেই পিওন গিয়ে হাঁক মারে—ভঞ্জমশাই, পেনশন।



লুকোচুরি

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। ঝুরি নামানো বটগাছ, ডাল-পালা, ঠাকুর মন্দির, পাশের বড় রাস্তা, এমনকি নবগঙ্গার ঘাটটাও আস্তে আস্তে আবছা হয়ে যাচ্ছে। বাঁশবাগান থেকে একটা শেয়াল যেই না হুক্কা হুয়া ডাক দিয়েছে, অমনি আশপাশের জঙ্গল থেকেও শুরু হল ক্যা ক্যা—হুক্কা হুয়া। তারপর কালাসাধুর মন্দিরে ঘণ্টা বাজতেই ঝপ্ করে রাত্তির নেমে পড়ল।

অসিত বড় রাস্তায় উঠে ডাক দেয়—রতন, বেরিয়ে আয়। ওরা হার মেনেছে।

একটু দূরে খড়ো চালের তলায় হেরিকেন জ্বালিয়ে কালীঠাকুর রঙ করা হচ্ছে। বটতলায় কাল পুজো। রাজাপুরের তিন্নাথ পালের চাদ্দিক ঘিরে ওদের বয়সী ছেলের দল।

সেই যে প্রতিমার ব'ড়ে বাঁধার দিন থেকে বিকেলবেলা এখানে খেলাধুলো শুরু হয়েছে, এখনও পর্যন্ত চলছে। পালমশায় নিজের মনে কাজ করেন আর এরা গোল্লাছুট, লুকোচুরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর সন্ধে হতে হতে পালমশায় যখন মুখে বিড়ি দিয়ে পা ছড়িয়ে বসবেন, তখনই বুঝতে হবে সেদিনকার মতন কাজ শেষ। কিন্তু আজকের কথা ভিন্ন। কাল পুজো। রঙ আজ যে করেই হোক শেষ করতে হবে। তাইজন্য দেরি হচ্ছে। ছেলেদেরও একটু অনিয়ম হচ্ছে বাড়ি ফিরতে। আবার আজকের খেলাতে রবিরা একটু দেরি করেই হার মেনেছে। সুতরাং, যে লুকিয়ে আছে সে তো

তার আগে কোনমতেই বেরোতে পারে না। এটাই খেলার নিয়ম। এই হচ্ছে লুকোচুরি।

অসিতের সঙ্গে আরও দু'তিনজন বটতলা ঘুরে ঘুরে মুখের ওপর হাতের চোঙা করে ডেকে চলে—চলে আয়। হার মেনেছে। অথচ রতনের সাড়া নেই।

অল্প অল্প বাতাই বইছে। বাঁশবাগান থেকে বাঁশে বাঁশে ঠোক্কর লেগে কটকট আওয়াজ আসছে। সেই বিকেলবেলা ওদের দলটা যে যার মতন পশ্চিমমুখো মুখ ফিরিয়ে ছিল। তারপর এক থেকে পঁচিশ গুণতে গুণতে যে যার মতন গাছে বা খড়গাদার তলায় লুকোল। তখন একবার মাত্র আওয়াজ দিয়েছিল—কুউক···। এরপর সব চুপ। অর্থাৎ এবার খোঁজ। খুঁজে বের করলে তবেই জিত। সবাইকে পাওয়া গেছে কিন্তু রতনকে এখনও পায় নি। না পেলে এবং অন্যদের কাছে হার স্বীকার করলে'পর তবেই অন্যদের সে খেলায় জিত।

এরা এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠছে। রেগেমেগে যা-তা কথা বলছে। তবু ও আসছে না কেন! খানিক বাদেই তিন্নাথ পাল রঙতুলি গুটিয়ে শুতে যাবে। তার বিড়ি খাওয়া শেষ। পুজোর সেক্রেটারির সঙ্গে বোধহয় কিসব কথা বলাবলি করছে।

রবি বলল, আমাকে খড়চাপা দিয়ে বলে গেল—একদম নড়বিনে আমি খড়ের তলা থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুই কোথায় থাকবি? বলেছিল, ওই বাঁশবাগান নয়তো সোমনাথদের কাঁচামিঠে গাছে। কিন্তু কোথায় ও? সাড়া দিচ্ছে না কেন? ওরা এ ওর দিকে মুখ চাওয়াচায়ি করে। —ইয়ার্কি ভাল্লাগে না কিন্তু। আমরা চলে গেলাম শেষবারের মতন অসিত চেঁচিয়ে বলে দিল।

অমাবস্যার গোন বলে আকাশে এতটুকু ফর্সাভাব নেই। মস্ত

বাগানজুড়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু জোনাকির দু'একটা মিটিমিটি আলো জ্বলছে।

দীপু কথার মাঝখানে বলল—দাঁড়া, এক্ষুনি ওকে নামিয়ে আনছি। বলেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—রতন, ওই দ্যাখ বাঁশঝাড়ে কালোমত কী দেখা যায়।

তাতেও ছেলেটির সাড়া নেই। 'আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু।' রাত্তির আরও কালো হয়ে উঠছে। থানার পেটানো ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা পড়ল। অসিত বলল, তাহলে ও কি বাড়ি চলে গেল?

—না, তা হবে কেন? ওর বাবা কি ডাকতে এসেছিল?

—তবে হয়ত লুকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়েছে। ঘুমিয়ে আছে দেখ্‌ ।গয়ে।

—যাঃ। কীসব বোকাবোকা কথা বলছিস।

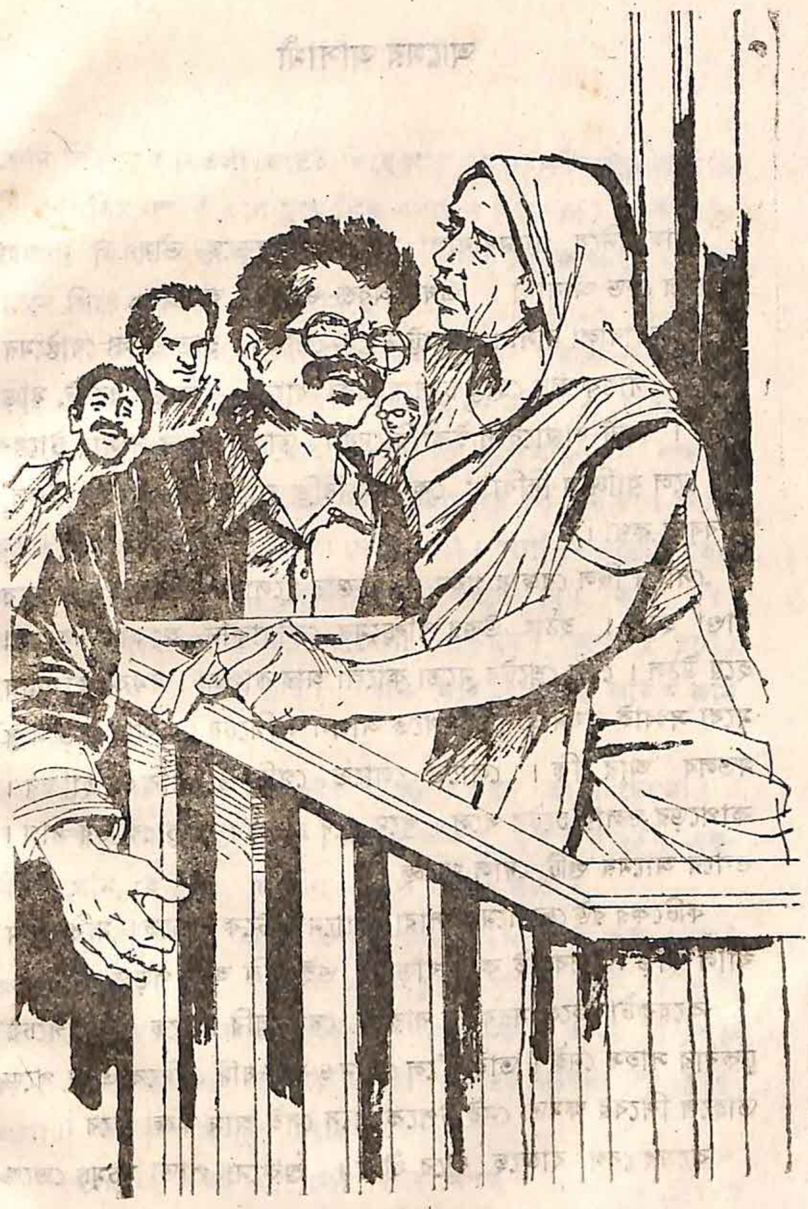
এমন কথা বলাবলি করছিল ওরা। কাছের বন্ধুদের কে কোথায় রয়েছে শুধু কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। এমনিতে চেনা যায় না। সবাই কিন্তু এবার একদম চুপ। পাশ দিয়ে কী যেন সরে গেল। শুধু একটা সরসর শব্দ হল। একটা ভয় মনে আসছে অনেকের মনে। সেদিন রাত্তিরে এই বটতলা দিয়ে ফেরার পথে কেলো বোষ্টমকে দেখে কে নাকি বাঁশঝাড় থেকে খিলখিল করে হেসে দিয়েছিল। যে বাড়িই ভিক্ষে করতে গেছে সেখানেই এই গল্পটা বলে সাবধান করে দিয়েছিল। 'খবরদার, একা একা ও রাস্তা দিয়ে রাত্তিরে কেউ আসবে না।' তাহলে সত্যি সত্যি কি কোনও ভূত এসে মাটিতে পুঁতে রেখে দিয়েছে। নাকি কোনও পরী এসে ডানায় করে তুলে নিয়ে গেল।

সর্বনাশ! যদি বোষ্টমের কথা ঠিক হয়। ঠিক আর হবে কেন, এ দেখি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। পাল মশাইকে জানাবে?

সবাই রতনকে নিয়ে কিছু না কিছু ভাবছে, এমন সময় বটগাছের ঝুরি নামানো ফোঁকর থেকে ভূতের গলায় সাড়া এলো—এঁই যে আঁমি!

হেরিকেন হাতে তিন্নাথ পাল আর পুজোর সেক্রেটারি 'ভূত, ভূত' বলে দৌড় দিয়েছে। শুধু অন্ধকারের মধ্যে বোঝা গেল দ্রুত-গতিতে সোজা রাস্তায় একটা আলো জ্বলছে নিভছে, জ্বলছে নিভছে। তারপর দীপুদের গাবতলা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

রতন বেরিয়ে এসে যত বলে 'আমি রতন, আমি রতন'—আর রতন! পালমশাই আর নিতাইকাকার সঙ্গে ওরাও যে কোথায় দৌড় দিল,—কে কার কথা শোনে! সেও যে পাল্লা দিয়ে সামনা-সামনি মুখ দেখিয়ে বলবে—এই ছ্যাখ! সেই সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি রতন।



আমের আসামী

আম নিয়ে গ্যানদাবালা ফ্যাসাদে পড়েছে ভীষণ। মাগুরা কোর্টের হেড আসামী। এখন অবশ্য জামিনে আছে।

গ্যানদাবালা দাসী। ছোট্ট নামে গেনি। হাত নুলো বোষ্টমের বোন। গাঙকূলের ছোট্ট চালায় একা থাকে। চিড়ে কোটে, মুড়ি ভাজে। হাট-বাজারে পাইকারি দেয়। তাতে একার সংসার টায়ে-টুয়ে চলে যাচ্ছিল দিব্যি। কেন যে বিশ্রি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল, ভাববার কথা।

সেদিন ছিল বেজায় গরম। রাস্তার ধুলোমাটি গরমের পর সবে ঠাণ্ডা হচ্ছে। হঠাৎ উত্তর পশ্চিমের কোণাকুনি আকাশ কালো হয়ে উঠল। মেঘ শ্লেটের মতো কালো আর ঝাপসা। দমকা হাওয়ার মধ্যে সব্বাই যেন হাওয়া খেতে আসল বাগিচেয়। আম কুড়নোর মতলব আর কি। লোভে লোভে গেনি ঠাকুরঝিও হাজির। কাপড়ের তলায় চটের থলে। খুদে খুদে চোখের নিচে শ্বেতির দাগ। ওপরে আমের গুটি দোল খাচ্ছে।

ফটিকের বউ ছেলেমেয়ে সারা বাগানে ছিটকে রয়েছে। মধ্যিখানে খালি ঝুড়ি। সবারই কান খাড়া। ওই বুঝি আম পড়ল।

কয়েকটা ছেলে সরকারি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। বাগিচেয় ঢুকবার সাহস নেই। তাই ব'লে কোনও গুটি যদি এদিকে এসে পড়ে তাহলে শিবের ক্ষমতা নেই টপকে এসে সেই আম কব্জা করে।

ঝড়ের বেগ বাজছে ধীরে ধীরে। শুকনো পাতা মুচমুচ ভেঙে

গেনি সিঁদুরে আমতলা যেতেই শিবে আর ওর মা কটমটিয়ে তাকায়। দিদি-পিসির সম্পর্ক বলে মুখে কিছু বলতেও পারে না। এই আম-বাগিচা নিয়েই তো ঝামেলা হচ্ছে। গেনি দৈনিক ভাই বোষ্টমের কানে গিয়ে ফুসমন্তর দিয়ে আসছে।

সাদা কাপড় পরনে গেনি ঘোরাঘুরি করে। করতে করতে দুঃখ করে শ্লোক দেয়—আহা! এক মরণে দু'জন ম'লো। চটের থলে সামলে চোখ মোছে। শেষে থলে-রহস্য ধরা পড়ে যায়—সেই লজ্জায়।

তীর্থে যাবার আগে একদিন রান্নাঘরের পিঁড়েয় বসে কালন ফটিককে বলেছিল—আমি তো তোর মাসী। অ্যাদ্দিন রয়েছি তোর কাছে। উকিল ডাক। বাগানটাগান লিখে নে। কবে ম'রে যাবো। শেষে গেনি এসে ঝামেলা পাকাবে। অশান্তি হবে। কেননা ওরাও যা, তুইও তাই। গেনি আর বোষ্টমকে অনেক জমি দিয়েছি লিখে।

ফটিক বলত, আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন তো মরছো না।

কিন্তু এখন টেরটি পাচ্ছে। কালন-মাসীর কথাই রাইট। এক-দিকে গেনি, বোষ্টম। অন্যদিকে একা ফটকে সাহা।

একটু এগোতেই জোরে এক ঝাপটা মারতেই টিপ করে বড়সড় একটা আম পা ছুঁয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। গেনি পা তুলে উঁহু উঁহু করে। বলল, মানুষটার বরাতে নেই। এমন সাইজের ফল!—এইভাবে মন ভিজিয়ে আমটা তুলতেই ফটকের বউ তেড়ে এলো। ততক্ষণে টিপঢাপ আরও পড়ছে।

—খবরদার, একটু এগোলেই বিপদ আছে।

ছেলেমেয়েরাও কিলবিলিয়ে ছুটে আসছে। গতিক খারাপ। থলেশুদ্ধ হাত উঁচিয়ে গেনি বলল—তবে রে!

গ্যানদাবালা ঝড় মাথায় করে গাঙকূলের রাস্তা দিয়ে দৌড় দিয়েছে। সামনের বড় রাস্তায় কেবল ধুলোর চক্কর চলছে। গরু-বাছুরের হাম্বা, কোনও বাড়ির ছেলেকে ডাকার শব্দ আর মেঘের ডাকের শব্দ শুনতে শুনতে সোজাই যাচ্ছে গেনি। সামনে ফুকম। পঞ্চার পান-বরোজ, বেলতলা, কালাসাধুর মন্দির টপকে গেলেই বোষ্টমের বাড়ি। ওই টিনের ব্যাড়ায় 'সাধনা ঔষধালয়'-এর নাম লেখা। সেই অব্দি কোনরকমে পৌঁছেই ঘরে ঘা মারে—ওরে বোষ্টম দেখে যা, ফটকের বউ-এর তেজ! —তোরা থাকতে আমাকে···। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে গেনি।

ঘরে যে বোষ্টম নেই। সে হয়তো মেছো-বাজারে তাস খেলছে। গোলাম। টেক্কা। কিন্তু গেনি তো তা জানে না। সে আরও জোরে ঘা মারে।

মুরারি তার সেজ ছেলে। রমনা সার্কাসে খেলা দেখায়। সে গোয়াল-ঘর থেকে সাড়া দেয়—দাঁড়াও, পিসি। বাবাকে ডেকে আনছি।

গ্যানদাবালা সেই ঝড়ের মধ্যেই আসছে। পিছনে নুলো-বোষ্টম রবারের জুতো ঢকর ঢকর শব্দ তুলে যাচ্ছে। মুরারি ওই আগে। দেখতে দেখতে সেই বাগিচা। সারা বাগানে ওরা আগের মতই ছড়িয়ে আছে। মাঝে ডাঁই-দেয়া আম। রাস্তার ছেলেরাও অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। ওই সময় কে কার কথা শোনে। পেয়েছেও দু'একটা

মুরারি-বোষ্টম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গেনি কোন্ ফাঁকে যে ফটকের বউকে ধাক্কা দিয়েছে তা কেউ খেয়ালই করে নি। গেনির

রাগ রয়েছে যে। আর ধাক্কা দিতেই ফটকের বউ চিৎপাত। সেই তালে ডাঁই-করা সব আম থলের মধ্যে পুরে বাঁশতলা দিয়ে সোজা বাড়ি।

শিবেরাও কিছু বলতে পারল না। মুরারি হাতের মার্সেল বাগিয়ে আছে। বোষ্টমও তেমন দাঁড়িয়ে। আর সাবধান করে হাঁক দিচ্ছে—খবর্দার খবর্দার।

চেঁচামেচি হট্টগোলে ছেলেদের পোয়াবারো। যে যার আম কুড়োচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না এ সময়। কেননা ঝগড়াটা বেশ জোরেই লেগেছে। চেঁচামেচির মধ্যে শিবে ওর মায়ের মাথা ধরে আছে।

আর দেরিফেরি নয়। পরদিনই ফটকে সাহা চুপিচুপি নালিশ দিয়েছে ফৌজদারি কোর্টে। শমন পেয়ে গেনির তো চক্ষু চড়কগাছ। গেনি তার হেড আসামী। আজকে বিচার হবে।

কোর্টের সামনে পাকুড়গাছ। তার তলায় দু'পক্ষ। সঙ্গে কিছু সাক্ষীসাবুদ। নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ চলছে।

গেনির জামাই এসেছে ঝিনেদা থেকে। হাতে পদ্মপাতায় কাঁচাগোল্লা। হাত বাড়িয়ে মিষ্টির মোড়কটা নিল বটে, মাথায় দুশ্চিন্তা। কখন ডাক পড়বে। সাক্ষী দিতে হবে। জামাই সান্ত্বনা দেয়—চিন্তার কারণ নেই। সবকথা জোরে জোরে বলবেন।

দুপুরবেলায় গাছের ডালে কাক-পক্ষীর কিচিরমিচির। আইসক্রিম, পানবিড়ি—সিগারেট। কোর্টের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবিবর উকিল শিখিয়ে দিচ্ছে মাথায় ব্যাণ্ডেজ শিবের মাকে—হাকিম জিজ্ঞেস করলে কী বলতে হবে।

ঢং ঢং করে থানার ঘড়িটা বেজে উঠল। ঘণ্টা পেটানো শেষ হতেই টুপিপরা আর্দালি বারান্দায় এসে ডাক জুড়ল—গ্যানদাবালা আমের আসামী, হাজির!

বড্ড অসময়েই ডাকটা পড়ল। সবে কাঁচাগোল্লার দলাটা মুখে পুরেছে। তারপরই খপ খপ। অর্থাৎ গোগ্রাসে গিলতে গিলতে পড়ি কি মরি ছুট দিল ভিড়ভাট্টা ঠেলে।

হাকিম সাহেব নির্দেশ দেন, ঘোমটা খুলুন।

গেনি সেদিকে কান দেয় না। সামনে বেজায় ভিড়। আসলে ঘোমটার আড়ালে দরদর ঘামছে।

এবার প্রশ্ন করেন, কী হল ঘোমটাটা খুলুন।

বোষ্টম সেই ফাঁকে বলে দেয়—স্যার লজ্জা।

সবাই হেসে ওঠে একসঙ্গে।

হাকিম বলেন, বেশ। তা, আপনি কি ধাক্কা দিয়েছিলেন?

সেই এক অবস্থা। তবে কলাবউ-এর মতন একহাতের ঝোলানো ঘোমটা নড়ে উঠল। তার মানে 'হ্যাঁ'।

সব শুনে নিলেন হাকিম। দু'পক্ষেরই কথাবার্তা শুনে খাতায় কীসব লিখলেন। তারপর বিচারের রায় বেরোল—শিবুর মাকে দৈনিক এক পোয়া দুধ আর ওষুধের সব খরচা দিলেই মুক্তি।

ঘোমটা ফের কাত হল। অর্থাৎ এ বিচারে আপত্তি নেই গ্যানদাবালার।





আজম সাহেবের বাস

কাল মামাবাড়ি যাবো। চৌধুরীদের বোঝাই নৌকো কালীবাড়ির ঘাটে এসে ভিড়েছে। দু'দিন ধরে পাট নামিয়ে আবার ফিরে যাবে খুলনা শহরে। পথে পড়বে রাজাপুরের মস্ত আড়ত।

ওই আড়তে গিয়ে ব্যাপারীদের কী কী জিনিস নিয়ে যেতে হবে, কোনও কিছু খুলনা থেকে আনতে হবে কি না—এসব ঠিক হয়। ওখানে বড়মামা যায়টায়। সেই থেকে চেনাশোনা হয়ে গেছে মামার সঙ্গে। ব্যাপারীরা মাগরোয় এলে'পর আমাদের বাড়ি আসবেই। মামার সঙ্গে চেনাশোনা মানেই আমাদেরও মামা। তাই একটা আত্মীয়ের সম্পর্ক হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে মায়ের কাছে আম-পেয়ারা বা সুপুরির থলে তুলে দিয়ে বলবে--এই নাও দিদি, বড়দা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মামাবাড়ির সামনে মস্ত গাঙ। এপার থেকে ওপারের মানুষগুলো কেমন ক্ষুদে ক্ষুদে লাগে। আর যখন লঞ্চ যেত, সেই শব্দ শুনলেই এক দৌড়ে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে পড়তাম। সে কী ঢেউ! ইয়া উঁচু হয়ে তীরের গাছপালাকে ছুঁয়ে যেত। কূলে কোনও ছোট নৌকো থাকলে সেই ঢেউয়ে এমন দুলত, বুঝি এক্ষুনি ডুবে যাবে।

সেই রামদেবগাঁতি থেকে কেউ এলে মনে হত সেই লঞ্চের ঢেউ, বরোজে পান তোলা, মামার সঙ্গে নৌকোয় করে রাজাপুরের হাটে গিয়ে তিলেখাজা কেনার কথা মনে পড়ে। ইচ্ছে হয় সেদিনই তাঁর সঙ্গে মামাবাড়ি যেতে। বাবা বলেছে নিয়ে যাবে। মা বলত, ঠিক আছে, চৌধুরী-মামাদের সঙ্গেই যাবি।

আশায় আশায় দিন যায়। কবে ব্যাপারী-মামাদের পাট নামানো শেষ হবে। চৌধুরী-মামারা এবার বাড়িতে আসতেই মা'র সঙ্গে সামনাসামনি কথা হয়েছে। যাবার বেলায় তাকে নিয়ে যাবে। এবার নাকি যেতে দেরি আছে। আমি রোজ রাত্তিরে শোবার আগে মনে মনে ঠিক করতাম মামাবাড়ি গিয়ে কী করব। কোথায় কোথায় যাব। পরদিন স্কুলে যাবার নাম করে কালীবাড়ির ঘাটে যেতেই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। চৌধুরী-মামারা ঠকিয়েছে। রাগের চোটে বাড়ি এসে ভাত খাইনি। মা সান্ত্বনা দিল,—অমন করিসনে খোকা। দেখিস, সামনের তারিখ ঠিক পাঠিয়ে দেব।

এবার অনেকদিন বাদে এসেছে চৌধুরী-মামারা। নান্দোল স্কুল থেকে ফেরার পথে সাঁকো থেকে দেখলাম একটা পালতোলা জাহাজি নৌকো এদিকেই আসছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝলাম—হ্যাঁ, অবিকল সেই। নৌকোর মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা, মালা পরানো। আর যে লোকটা দাঁড় বাইছে সেই তো চৌধুরীমামা। এক ছুট দিয়ে বাড়ি এসে বললাম। এবার আর আপত্তি হল না। রাত পোহালেই নৌকোয় উঠব। ফিরব আজম সাহেবের বাসে।

বাবা যাবার আগে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বলল, সক্কালবেলা যে বাস আগে আসবে, যে বাসের সামনের মুখটা সবুজ রঙ করা—সেই বাস। তেঁতুলতলা প্রাইমারি স্কুলের সামনে এসে হাত তুললেই উঠিয়ে নেবে। আর ঢাকা রোডের পর থেকে তো তুই নিজেই চলে আসতে পারবি। আমি ঘাড় হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বললাম। বাবা আরও বলল—কনডাকটর ভাড়া চাইলে বলবি বাবা আজম সাহেবের বাড়ি কাজ করে। আর পয়সা চাইবে না।

বাঁশের খুঁটিতে অনেকদিন ধরেই পয়সা ফেলছি। যাবার দিন খুঁটি কেটে নিয়ে গেলাম। হাতে দু'চারটে পয়সা থাকা ভালো।

আগেরবার অবশ্য চৌধুরী-মামাদের নৌকো করেই ফিরেছিলাম। তাই এতটা পথ আসতে পয়সা লাগে নি। কিন্তু বাসঅলাদের আমি দেখিনি। কেমন লোক—রাগী না ভালো, তাও জানিনে। ঠিক আছে। দেখা যাক তো!

প্রথমে আমাদের স্কুল, পাটনীর চালাঘর। ইস্পাহানী কোম্পানির গুদোম-ঘর রেখে কখন যে নৌকো তীরমুনীর জলে এসে গেল টের পাই নি। সন্ধে হয়ে আসছে। তখনও আমি নৌকোর ছাদে। হঠাৎ চোখ গেল দক্ষিণ দিকের কূল ঘেঁষে বটগাছ আর ঝাউবনের মধ্য থেকে গলগল গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—মামা, ওখানে কাদের বাড়ি আগুন লেগেছে? মামা কী ভেবে নিয়ে দাঁড় থামিয়ে বলল—শিগগির ভেতরে যাও। কোথাও আগুন লাগে নি। ওটা সাতদোঁহার শ্মশান। মরা মানুষ দাহ করছে।

নৌকোর পাটাতনে শুয়ে পড়লাম। দাঁড় দিয়ে জল-কাটার শব্দ হচ্ছে। ছপ্ ছপ্। তালে তালে। এসব শুনতে শুনতে তারপর কখন যে ঘুমিয়ে গেছি মনে নেই।

মামাবাড়ি গিয়ে দাদার সঙ্গে স্কুলে গিয়েছিলাম। সেদিন রণদাদাদের গরমের ছুটি পড়বে। ক্লাসের মাস্টারমশাই রোলকল করার পর আমাকে দেখে বললেন,—এ ছেলেটা কে?

রণদাদা বলল—আমার পিসতুতো ভাই। মাগরো টাউনে বাড়ি।

—তা বেশ। তোমাদের বাংলা বইয়ের নাম কী। একটা কবিতা মুখস্ত বলো তো। গান জানো?

আমার চুপ করে থাকা দেখে রণদাদা বলল, কী রে, চুপ করে আছিস কেন, ভয় কী? তারপর এক এক করে সব বললাম। দাদা খুশি হয়ে আমতলার রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বলেছিল মাস্টারমশাই ভালো, না?

এদিক-সেদিক বেড়িয়ে খেলাধুলো করার ফাঁকে কখন যে গরমের ছুটি শেষ হয়ে বাড়ি ফেরার সময় হল বুঝতে পারি নি। বড়মামা একদিন খাবার সময় বললেন কাল বাড়ি যেতে হবে কিন্তু। স্কুল খুলছে। পুজোর সময় আবার আসবে।

মনটা একটু খারাপ হয়েছিল বটে। যখনই বাবার সেই বাসে ফেরার কথা বলল মামা, তখন একটু ভালো লাগল। এইবারই বাবার কথামতন মোটরবাসে চড়ব।

ভোরবেলা। পাখিরা কিচিরমিচির ডাকছে। বাটাজোড় থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা বাস আসছে। হাত তুলতেই থেমে গেল। মামাকেও বাবা চিঠিতে বলে দিয়েছে নাম করতে। এক মালিকের কাছে কাজ করলে ভাড়া নাকি লাগে না।

খুব একটা ভিড় নেই। টাটকা সবজি, তু'চারটে মাছের ঝাঁকা, অল্প কিছু লোক। ধানমাঠ, গাছগাছালি ফেলে সোঁ সোঁ বেগে বাসটা ছুটছে।

—পথেরহাট কে নামবেন!—কনডাকটর হাঁকল।

যাত্রী তুলেটুলে আমার কাছে ভাড়া চাইল। 'টিকিট?'

কাঁচুমাচু মুখ করে বাবার কথাটা বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠল কনডাকটর।—তোমার বাবা কাজ করে তো আমার কী?—একটাকা পঁচিশের হাফ টিকিট দশ আনা। দাও, নয়তো সামনেই নেমে পড়ো।

হঠাৎ করে কানে তালা লেগে গেল যেন। সঙ্গে কেউ নেই। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হাত-পা কাঁপছে। গাড়িতে এতগুলো লোক।

লজ্জা বাঁচাতে ঘড়ি পকেটে হাত দিয়ে বের করলাম জমানো সেই পয়সাগুলো।

—আর দু'আনা?

চোখের জলে ঝাপসা দেখছি। অন্য কে যেন বললেন—যাক ভাই, নিয়ে যান। লোকটা জিজ্ঞেস করল—কোথায় নামবে, খোকা?

—মাগুরা।

এলাম বটে। বাড়ি আসার পর মুখে কোনও কথা নেই। নাড়ু, সুপারী ছুঁড়ে দিলাম বারান্দায়।

বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখল। যেন এক্ষুনি সেই কথাটাই বলবে—কী, বলেছিলাম না, ভাড়া লাগবে না। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে বলল, কখন ফিরলি? ভাড়া নিয়েছে? ওরা আমাকে চিনতে পেরেছিল?

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—নিয়েছে তো!

—বলিস কী? বাবা অবাক হয়ে যায়। তারপর নিজে থেকেই একসময় বলে—মন খারাপের কী আছে? লোকটা হয়তো নতুন চাকরিতে এসেছে। আমকে চিনতে পারে নি—কাঁদিসনে। কালই সাহেবকে নালিশ করে দেব কেন আমাদের রতনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। বাছাধন টেরটি পাবে তখন!



মাছ ধরার গল্প

সে কী ঝড়! সঙ্গে বৃষ্টি। সোঁ সোঁ শব্দ দুদ্দাড় ভেঙে পড়ছে আমডাল ও সুপারী গাছের মাথা। বোঁটা ছিঁড়ে ঝুনো নারকেল লতাপাতার মধ্যে গিয়ে পড়ল। ঝুপ। গোয়াল ঘরে শিলাবৃষ্টি আর আমের গুটি যুক্তি করে ইংরিজি বাজনা বাজাচ্ছে। খাপরার চালে মাথা কুটছে দু'তিন তলা বাড়ি-সমান বাঁশঝাড়।

ঝড় তো না, বুঝি দেও-দত্যিরা ইয়া ইয়া থাম্বা হাতে ঝাঁকানি দিচ্ছে। তাই ঘর যখন মচমচ, পবন ঠাকুরের নাম স্মরণ করে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে মা। তিনবার। মিতু কাঁদো কাঁদো হয়ে মায়ের হাঁটু আগলে আছে। রতন ভয় পাবার ছেলে নয়। যত বৃষ্টি তত মজা।

—পুঁটিবিলে আজ খুব মাছ পড়বে, না মা?

—এখন চুপ কর তো।

মুখটা ব্যাজার দেখায় মায়ের। ঘরের মধ্যে হারিকেনের আলো তিরতিরিয়ে কাঁপে। তারমধ্যে বেজায় শীত। দুপুরবেলা যে অত গরম ছিল তা কে বলবে!

আজ বিকেলে লুকোচুরি খেলার ফাঁকে চোর সেজে সে আর দুবাই পুঁটিবেলে ফুঁট কেটে এসেছে। গা-চিড়বিড় গরমে বুঝেছিল আকাশের লক্ষণ ভালো নয়। বৃষ্টি না হয়ে যায়ই না।

প্রথম প্রথম দুবাই বিশ্বাস করে নি। বলেছিল দুর, বিষ্টিফিষ্টি হবে না। ও থাকলে এখন গাট্টা কষে বুঝিয়ে দিত। যাক। এখ[ন] থামতে যে দেরি। টপাটপ কই।

ভাগ্যিস বুদ্ধিমত সন্ধের মুখটায় নালসের ডিম ভেঙে রেখেছিল। নয়তো যে তাণ্ডব, কখন বাসা ছাতু হয়ে গেছে। নালসের ডিম পাড়তে ছাই মাখেনি বলে বেদম কামড় খেয়েছে রতন।

বুকের খাঁচায় এখন মাছরাঙা পাখি। হাত দিলে বোঝা যাবে ঢিবঢিব করছে। চিইক চিইক করে একবার পুঁটিবিলে উড়ে যাচ্ছে আবার ফেরত আসছে।

ঝড়ের জন্য অত ভাবে না। সে রান্নাঘরের কঞ্চির বেড়ায় ছোট্ট ঘটে নালসের টোপ ঝুলিয়ে রেখেছে। ঘর যদিও হেলে যায়, বাবা রথের মেলা থেকে ফিরেই ঘরে বাঁশের প্যালা লাগাবে। এরমধ্যে মা তাকে এক পা-ও নড়তে দেয় নি। কিন্তু জল পড়ে টোপ যদি গলে যায়, তখন ?

বাবা মেলায় দোকান নিয়ে যাবার সময় নিজে মুখে বলেছে ফিরে এসে একটা গোটা সিকি দেবে। মোটে তো আজকের রাত্তিরটা। বাবা এলেই কথামতো সিকি। দশ পয়সায় আরও চারটে কইমাছ মারা বড়শি, একটা কাটিমের সুতো। থাকবে পাঁচ। তা দিয়ে ময়ূরের ফাৎনা।

সে তো আর বাচ্চা নেই এখন। যেদিন থেকে সাঁকো পার হয়ে নান্দোলের স্কুলে যেতে শিখেছে, তারপরেই বাবা প্রত্যেক হাটে দশ পয়সা দেয়। রতন বাঁশের খুটি কেটে জমিয়েছিল। মা না ভীষণ হিংশুটে। পয়সা জমানো একদম দেখতে পারে না। কেমন যেন টের পেয়ে যায়। আর ঠিক সেই খেতে দেবার সময়ই বলবে—দে তোর পয়সাগুলো। একটা জিনিস করে দেব। কী করবে তা কিন্তু বলে না। শুধু বলে একটা জিনিস করে দেব। আর খুঁটিতে নয়, পয়সা গেঁজেয় ভরে সব সময় কোমরে নিয়ে বেড়াবে। বাবা ফিরলেই হয়।

ঝড়বৃষ্টি কমে আসছে। ভাটি বাগানের পাতায় টপটপ শব্দ। ঘুম আসছে। চোখ জড়িয়ে ঘুম। কয়েকটা কাকের কা কা ডাক শোনা যায়। ওদের বোধহয় বাসা ভেঙে গেছে। সারা ঘরে এখন চুপচাপ অন্ধকার। মা হারিকেনের আলো নিভিয়ে দিল। ঘুম···।

রতন কিন্তু জোরে জোরে পা ফেলছে। হাতে ছিপ। আর এক হাতে মাছ রাখার ঠিলে। তার মুখে মালায় ঢাকা নালসের টোপ।

গাঁয়ের আকাশে এখন নীল নীল আভা। বৃষ্টির পর এমনই হয়। মনটা ভীষণ চঞ্চল। ওই তো সামনে বটতলা। ওখানে ডুবাইয়ের দাঁড়িয়ে থাকার কথা। ডুবাই আসেনি নিশ্চয়ই। এলে'পর ডাক দিত। রতন মনে মনে রেগে গেল। ওর সঙ্গে এখন থেকেই আড়ি। বুঝবে মজা। আর একটু দেখা যাক। কিন্তু কোথায় সে। নাঃ। দাঁড়িয়ে লাভ নেই। রতন হাঁটতে লাগল।

একা একা গেলেও মনে মনে আনন্দই হচ্ছে। অনেকদিন বাদে যাচ্ছে মাছ ধরতে। খালি গা। পরনে হাফপ্যাণ্ট। মা আজ অবাক হয়ে যাবে। যে কইমাছ তারা কোনদিন কিনতে পারে না। সেই-জন্যেই তো নালসের টোপ। জয় মাখাল ঠাকুর।

একে একে জমির আল পেরিয়ে, দাশবাবুদের ঘাট ডিঙিয়ে তবেই তো পুঁটিবিল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। নতুন জল পেয়ে মাছ ঘাই মারছে। ঘাপাৎ। একবার লোভ ধরাতে পারলেই হল। জায়গা ছেড়ে উঠে আসা যাবে না।

কাছাকাছি আসতেই একটা খেঁকশেয়াল ইতিউতি তাকিয়েই সাঁ করে বাগানে। রতন বারবার এদিক ওদিক তাকায়। না, এখানেও ডুবাই দাঁড়িয়ে নেই। একবার জোরসে ডাক দিতে গেল। মনে হল গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না।

সারারাত আকাশ থেকে কলসী কলসী জল পড়েছে। তাই বাবলা গাছের সামনে ওই কচুরিপানার ধাপে উঠতে এক হাঁটু জল পেরোতে হল রতনের।

অত তাড়াহুড়োর কী আছে? বাঃ। তাড়া নেই আবার! চোখের সামনে মাছেরা অমন খলবল করে ডিগবাজি খেলে কে ঠিক থাকতে পারে!—হ্যাঁ, বুড়ো আঙুলে বড়শি বিঁধে গেল। ইস! কী রক্ত। যতবার সে প্যাণ্টে মোছে ততবারই তাজা রক্ত। ধুস। মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে নেয় খানিকক্ষণ। তারপর কচুরিপানার ডাঁটা চিপে, কষ লাগিয়ে সুতো ভেজালো জলে। সেই জলে ছিপের টোকা মেরে বলল—আমার নাম বেনে মাছ উঠোব টেনে। আমার নাম··· তিনবার। বলতে হয়! তাহলে মাছ তুলে কুল নেই।

পুঁটিবিল কি আর এট্টুখানিক! বিলের ওপাশ থেকে মনে হয় আকাশ উঠেছে। আর সোজাসুজি তাকালে কালিকাতলার মহাশ্মশান। নৌকোয় করে মরা মানুষ নিয়ে যায়।

অথচ বারবার নিরাশ হচ্ছে রতন। বারবার ফাৎনা ডুবিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু মাছ কোথায়? টানার সময় হালকা। শুধু সুতো আর টোপশুদ্ধ ফাৎনা উঠে আসে। চিংড়ি বা কাঁকড়া নয় তো! না, যেভাবে ফুঁট কেটে গোবর ছড়িয়েছে তাতে তো কই আর ল্যাঠা।

কচুরিধাপে বিষপিঁপড়ের ঝাঁক। খুব জ্বালাতন করছে। কুট করে কামড়ে, এক্কেবারে ধরে থাকছে। একটু চুলকেটুলকে আবার টোপ গেঁথে ফেলল। সব ফক্কা। হঠাৎ মাথা সমান পানার মধ্য থেকে কে যেন কথা কয়ে উঠল। 'বঁড়শি না টঁড়শিও না, লোঁহা ব্যাঁকানো।'

চমকেটমকে না গিয়ে ভাবল, ছুর। ওসব কিছু না। আবার ফেলে।

ফের সেই ফিসফিসানি। এবার ফাৎনার দিকে নজর না দিয়ে আশ-পাশে তাকায়। তিরতির করে কাঁপছে ডাঁটাঅলা কচুরিপানা। কে যেন সরু দুব্বো ঘাসের মতো আঙুল বুলিয়ে ইয়ার্কি করার মতন সুড়সুড়ি দিয়ে গেল। ঘামাচির মতো খাড়া হয়ে উঠল রোমকূপ। গা-টা ভারী। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ।

রতন ছিপ হাতে নিয়েই পাশে তাকিয়ে দেখল তার ছায়া পুঁটিবিলের জলে। ঢেউ লেগে মাথানাড়া বুড়োর মতো দুলছে। সুযোগ পেয়ে বুঝি সেই নাকিসুরের কথাগুলো আরও কাছে চলে এসেছে। 'বঁড়শি না টঁড়শিও না, লোঁহা ব্যাকানো।'

রতনের গলায় থুথু পর্যন্ত নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখল ঝুলির বাগানের ফাঁক দিয়ে চাঁদটা যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। —ওরে সব্বোনাশ! কোথায় এসে পড়েছে সে। রতন ছিপ ফেলে এক দৌড় দেবার আগে প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে। মা…

মা পাটের নুড়ি দিয়ে ঘর লেপছিল। রাত্তিরের বৃষ্টি আর ঝড়ে মাটির প'টে ধুয়েটুয়ে মাটির ঢিবিমতন হয়ে গেছে। নতুন করে মাটির তাল লাগাতে লাগাতে বলল, কী রে খোকা?

বিছানায় শুয়ে শুয়েই রতন বুঝল সে স্বপ্নে চলে গিয়েছিল পুঁটিবিলে মাছ ধরতে। আর তখনই মেছো ভূত ওর নাগাল নিয়েছিল। এখন তার হাসিও পেল। সকাল হচ্ছে। জানালার ফাঁক গ'লে সূর্যের আলো এসে মিতুর চোখের ওপর পড়েছে। পেছন দিক্‌কার দরজা খুলতেই বাঁশতলার ডোবা থেকে ব্যাঙের ডাক শুনল। গ্যাঁ গোঁ…গ্যাঁ গোঁ ..আরেব্বাস। এত জল হয়েছে তাহলে। এবার তবে মাছ ধরতে যেতে পারে!